অনীক

আগস্ট ২০১৪

বর্ষ ৫১ □ সংখ্যা ২

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় □ ১

ঘটনাপ্রবাহ

গাজায় হত্যালীলা ❑ সমরেশ মিত্র ❑ ২

পাট-চিত্র ❑ অরিজিৎ ❑ ৭

উত্তরের চা-বাগান ❑ সুমন গোস্বামী ❑ ১০

এস্‌এস্‌সি প্রার্থীদের অনশন চলছে ❑ সুতনয়া ❑ ১২

অক্ষরধাম মামলার রায় ❑ সুমন কল্যাণ মৌলিক ❑ ১৩

প্রবন্ধ

রহস্যোপন্যাস নয় ❑ গৌতম চৌধুরী ❑ ১৬

শকুনির উত্তরাধিকার ❑ মানস ❑ ২০

বিবেকানন্দের নারী ভাবনা ❑ এষা বসু ❑ ২২

শতবর্ষে স্মরণ

সরোজ দত্ত স্মরণে ❑ সমরেশ মিত্র ❑ ৩০

বিপ্লবীর 'বাবু'-দর্শন ও প্রসঙ্গত ❑ অশোক চট্টোপাধ্যায় ❑ ৩২

স্মরণ

নবারুণ স্মরণে ❑ মীনাক্ষী সেন ❑ ৩৯

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :

প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯

দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা

ই-মেল : aneek.bm@gmail.com

ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**

সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

মাননীয় বিচারপতি, বিচার কি হবে দল দেখে?

সেলাম বিচারপতি, তোমারে সেলাম। আমরা আমজনতা, বিচারের কীই বা বুঝি। একটা ভুল ধারণা ছিল... ঐ চোখ বন্ধ দাঁড়িপাল্লাধারী মূর্তিটা দেখে বিভ্রম হয়েছিল যে আইনের চোখে সবাই সমান। আমাদের এই দেশটায় ক..ত..তো আইন। লোক যত না বাড়ছে, তার থেকে আইনের জন্মহার বোধহয় বেশি। এই তো সেদিন, ফেসবুকে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যঙ্গচিত্র দেখাবার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। মন্ত্রী-রাজনীতিবিদদের ব্যঙ্গচিত্র বিচিত্র তো কিছু নয়। কিন্তু সম্প্রতি পার্লামেন্টের এক এমপি প্রকাশ্য জনসভায় অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তিখেউর করে গেলেন... একবার নয়, তিন তিনবার... মহিলাদের সম্পর্কে জঘন্য ভাষা প্রয়োগ করলেন... ধর্ষণের হুমকি দিলেন... দলীয় ক্যাডারদের হিংসায় প্ররোচনা দিলেন... নিজে গুলি চালাবার হুমকি দিলেন, এইগুলো কি আইনের চোখে অপরাধ নয়? প্রশ্নটা উঠছে এই কারণে, এমপি নিজমুখে থুরি কলমে দোষ স্বীকার করে নিলেও, পুলিশের তরফে ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, তদন্তই শেষ হচ্ছেনা।

আমজনতা জানে, আইনের রক্ষাকর্তা হিসাবে পুলিশ কদাচিৎ আবির্ভূত হয়। তারা ক্ষমতার সেবক, ক্ষমতার রক্ষক। মানুষ তাই আদালতের কাছে গেল বিচার চাইতে। এক জজসাহেব পুলিশকে এফআইআর দায়ের করার এবং সিআইডি তদন্তের আদেশ দিল। বড়ো আদালত সে আদেশ নাকচ করে দিল। ''সরকার হচ্ছে অভিযোগকারী। এটাই আইনের বিধান। মা যদি তার ছেলেকে হত্যা করতে চায়, কেউই তাকে বাঁচাতে পারবে না।'' এটাই নাকি বড়ো আদালতের পর্যবেক্ষণ (*টাইমস অব ইন্ডিয়া*, ১ আগস্ট ২০১৪)। কৌরব সভায় ভীষ্মের নিষ্ক্রিয়তার কথাও বড়ো আদালত উল্লেখ করেছেন। আমরা কি আদালতকে 'ভীষ্মের' ভূমিকাতেই দেখব? সন্তান হত্যায় উদ্যত মাতাকে নিরস্ত করার দায় আদালতের নেই?

ন্যায়াধীশের ন্যায়বিচার আমজনতার বিচারবুদ্ধির অগম্য। বোধ আরও বিপর্যস্ত হয়, যখন দেখা যায়, বিরোধী রাজনৈতিক দলের যে নেতার ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলার জন্য সাংসদ মশাই জনতাকে তাতাবার চেষ্টা করেছিলেন, তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় অথচ চরম ঘৃণ্য কাজের জন্য যে প্ররোচনা দিচ্ছে, শুধুমাত্র শাসক দলের সাংসদ হওয়ার কারণে 'অসুস্থতার ঘেরাটোপে' সে নিশ্চিন্তে মুখ লুকোবার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। মহামান্য বিচারপতি, শুধু পুলিশ-প্রশাসনেরই নয়, বিচারালয়ের দাঁড়িপাল্লাও ক্ষমতার দিকে ঝুঁকে থাকে!

সারা দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা এখন অপরাধীদের দখলে। তাদের অধিকাংশই জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত। ২১ শতাংশ সাংসদের বিরুদ্ধে হত্যা, দাঙ্গা, নারীঘটিত অপরাধ ইত্যাদি মারাত্মক অভিযোগ বর্তমান। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ৩৫ শতাংশ সদস্যের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ আছে। ২৬ শতাংশ খুন, জখম প্রভৃতি মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত। শাসক দলের ১৮৪ জন বিধায়কের মধ্যে ৬৯ জন (৩৮ শতাংশ) অপরাধমূলক এবং ৫১ জন (২৮ শতাংশ) মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত। আদালতের বিচারে শেষ পর্যন্ত এদের কতজন শাস্তি পাবে সেটা অনুমান করা কষ্টকর। লক্ষ্মণপুর বাথের খুনিরা কিংবা দলিত ঘাতক ব্রহ্মেশ্বর সিং-রা তো আদালতের বিচারে বেকসুর হয়ে যায়, শাস্তি পায় জিতেন মারান্ডি এবং বিনায়ক সেন-রা। পশ্চিমবঙ্গে খোলাখুলি খুনের কথা কবুল করেও কিংবা উস্কানিমূলক বক্তৃতার ফলে কেউ খুন হয়ে গেলেও আদালত তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না। মাননীয় বিচারপতি, ''বিচার দেবার আগে জেনে নাও দেগে দাও প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দল''! (সৌজন্য- শঙ্খ ঘোষ)

দেশটাকে চেঁচেপুঁছে লুঠ করার জন্য অপরাধটাকে রাষ্ট্রতন্ত্রের (সিস্টেম) অন্তর্গত করা হয়েছে। আদালত কি তার বাইরে থাকতে পারে? মাননীয় বিচারপতি, তোমার বিচার একদিন জনতার আদালতেই সম্পন্ন হবে।

গাজায় হত্যালীলা

সমরেশ মিত্র

গত একমাস ধরে ইজরায়েল গাজা-ভূখণ্ড জুড়ে গণহত্যা চালাচ্ছে। ইজরায়েলের এই আক্রমণ আমাদের নাৎসি-জার্মানির ওয়ার্‌শ ঘেটো-র অত্যাচারের কথা স্মরণ করায়। গাজা ভূখণ্ড, যা প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত, সেই অঞ্চলে ইজরায়েল মার্কিন দেশ এবং আরব দুনিয়ার মার্কিন তাঁবেদার শাসকদের প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় সমর্থন নিয়ে আগ্রাসন চালিয়ে আসছে বেশ কয়েকটি দশক ধরে। প্যালেস্টাইনের ওপর ইজরায়েলের প্রতিটি আক্রমণই নৃশংসতার দিক থেকে আমাদের নাৎসি অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ঘটনার সূত্রপাত

ইজরায়েলের অভিযোগ, ইজরায়েল-অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাংক অঞ্চল থেকে তিনজন ইজরায়েলী তরুণকে ‘‘প্যালেস্টাইনী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন’’ *হামাস* সমর্থকরা অপহরণ করে এবং পরে তাদের হত্যা করে। এ বছরের ১২ জুন এই অভিযোগ তোলা হয়। *হামাস* তা অস্বীকার করে। এই ঘটনার ‘‘প্রতিশোধ’’ নেওয়ার জন্য ইজরায়েলী সেনারা মহম্মদ আবু কাদির নামে এক প্যালেস্টাইনী তরুণকে পাকড়াও করে তাকে জোর করে গ্যাসোলিন খাইয়ে তার মুখে আগুন লাগিয়ে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করে। মনে রাখতে হবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপের মাটিতে যখন নাৎসি সেনাবাহিনী পিছু হটতে শুরু করে, তখন তারা ইহুদি বন্দিশিবিরের বাসিন্দাদের ঠিক একই কায়দায় খুন করত— ওয়ার্‌শ এবং রিগাতে যে এমন ঘটনা তারা ঘটিয়েছিলো তার প্রমাণ মিলেছে নাৎসিদের বিচারের সময়— ন্যুরেনবুর্গ বিচারশালায়।

এতেও শান্ত না হয়ে ইজরায়েলের হানাদার সৈন্যরা ‘‘হত্যাকারীদের’’ ‘‘খুঁজে বের করার’’ জন্য গাজা-অঞ্চল এবং ওয়েস্ট ব্যাংক-এর অধিকৃত অংশে ব্যাপক খানাতল্লাসির পাশাপাশি ব্যাপক সন্ত্রাস সংগঠিত করে, সম্পূর্ণ বেআইনি এবং এক্তিয়ার-বহির্ভূতভাবে *হামাস*-এর কর্মী-সমর্থক-নেতা সহ প্রায় ৫০০ জনকে গ্রেপ্তার করে। প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা এই ব্যাপক বেআইনি এবং অমানবিক কাজের প্রতিবাদ করলে দখলদার ইজরায়েলী সেনারা গুলি চালিয়ে নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ৬ জনকে হত্যা করে।

প্যালেস্টাইনের জনগণকে সন্ত্রস্ত করার অভিপ্রায়ে দখলকারী ইজরায়েলী সেনারা জেরুজালেমবাসী তরুণদের হুমকি দিতে থাকে এবং একজন তরুণকে অপহরণ করে হত্যা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো প্যালেস্টাইনে ইজরায়েল-বিরোধী আবহাওয়া তৈরি করে গাজা আক্রমণের এক ছুতো খাড়া করা। এই প্যালেস্টাইনী তরুণের বিক্ষত দেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং জেরুজালেমে বিক্ষোভের ঝড় ওঠে।

ইতিমধ্যে ইজরায়েলের সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয় যে, ইজরায়েলের সেনাবাহিনীর অভিযোগ মতো তিনজন ইজরায়েলি তরুণকে *হামাস* সমর্থকরা ‘‘অপহরণ করে হত্যা’’ করেনি— তারা একটি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের ফলে নিহত হয়েছে।

বর্তমান আগ্রাসন

কিন্তু এতসব মিথ্যাচারের পরও ‘‘*হামাস* সন্ত্রাসবাদী’’-দের হাত থেকে ‘‘আত্মরক্ষা’’-র জন্য ৭ই জুলাই ২০১৪ থেকে ইজরায়েলী সেনাবাহিনী গাজা ভূখণ্ডে পরিকল্পিত সশস্ত্র হামলা শুরু করে। বোমা বর্ষণ শুরু করার মাত্র একঘণ্টা আগে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ আকাশপথে প্রচারপত্র বিলি করে বলে যে গাজার অধিবাসীবৃন্দ যেন তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে আরও দক্ষিণ বা পশ্চিমে পাড়ি দেয়। এরপর ১০ জুলাই তারা গাজার বেট লহিয়া, বেট-হানুন এবং আবশাল আল-সজ্ঘিরা অঞ্চলের অধিবাসীদের টেলিফোন করে এই একই বার্তা দেয়।

গাজার অবস্থানই এমন যে গাজার অধিবাসীদের গাজা ছেড়ে অন্যত্র সরে যাওয়া কার্যত অসম্ভব। গাজার দুদিকের সীমান্তে রয়েছে ইজরায়েল, যেখানে ‘‘সীমান্তের’’ ১০০ মিটারের মধ্যে কোনো প্যালেস্টাইনের অধিবাসী এসে পৌঁছোলে তার একমাত্র ‘‘শাস্তি’’ ইজরায়েলী বুলেটের আঘাতে মৃত্যু। গাজার আর একটি সীমান্ত রয়েছে মিশরের সঙ্গে। মিশর তার সেই রাফা সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। মার্কিন মদতে মিশরে বর্তমানে আল-সিসি-র নেতৃত্বে যে সরকার আসীন, তারা বলে দিয়েছে যে, তারা যে সমস্ত আহত ব্যক্তিদের আপৎকালীন চিকিৎসা প্রয়োজন মনে করবে, কেবল তাদেরকেই মিশর সীমান্ত অতিক্রম করার অনুমতি দেবে। আর সমুদ্রের দিকে গাজাকে ঘিরে রেখেছে মার্কিন দেশ থেকে আমদানি করা ইজরায়েলী নৌবহর, যারা ক্রমাগত বোমাবর্ষণের হুমকির মধ্যে উপকূলবাসী প্যালেস্টাইনীদের সন্ত্রস্ত করে রেখেছে।

ইজরায়েল প্রতিদিন একটু একটু করে গাজার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ তীব্রতর করেছে। মাঝে মাঝে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির ছল করলেও তারা একতরফা ভাবে যুদ্ধ-বিরতির সময়সীমা লঙ্ঘন করেছে। ৭ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত ২০০০ জন অসামরিক প্যালেস্টাইনী নাগরিক বোমার ঘায়ে মারা গেছেন, এদের মধ্যে একটি বড়ো অংশ শিশু। ইজরায়েলী সেনাবাহিনী বেছে বেছে বাচ্চাদের বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং নাগরিক পরিকাঠামো সহ অসামরিক বসত এলাকায় তাদের আক্রমণ

কেন্দ্রীভূত করেছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেইহু প্রকাশ্যেই বলেছেন (ইজরায়েল রেডিও, ১১.৭.১৪) যে "*হামাস*-এর বদমায়েশরা প্রতিটি মসজিদকে অস্ত্রাগার, প্রতিটি বাচ্চাদের স্কুলকে কম্যান্ড পোস্ট এবং প্রতিটি হাসপাতালকে তাদের যুদ্ধের ঘাঁটি করেছে— আমাদের তাই এই লক্ষ্যবস্তুগুলি ধ্বংস করার অধিকার রয়েছে।"

নিউইয়র্ক টাইমস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি ঐ একই দিনে বলেন যে "গাজার বিরুদ্ধে আমাদের এই যুদ্ধ এখনও পর্যন্ত পূর্বপরিকল্পনা মতোই চলছে— আমরা অদূর ভবিষ্যতে আরও বড় পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে চলেছি।" এরপর ইজরায়েলের গোয়েন্দা দপ্তরের মন্ত্রী ইজরায়েলের বেতারে বলেছেন, 'ইজরায়েলের সামরিক বাহিনীকে হয়ত গাজা ভূখণ্ডকে সাময়িকভাবে দখল করে ফেলতে হবে।" গাজা ভূখণ্ড দখলের এই যুদ্ধকে ইজরায়েলের সেনাবাহিনী একটি গালভরা নাম দিয়েছে—"অপারেশন প্রোটেকটিভ এজ"। এই অপারেশন শুরু হওয়ার প্রথম চারদিনেই ইজরায়েলী ক্ষেপণাস্ত্র এবং স্থলপথে হানায় বিধ্বস্ত হয় বাচ্চাদের বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মসজিদ, পানীয় জল পরিশোধনাগার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং *হামাস*-এর নেতা-মন্ত্রীদের আবাস-স্থল। প্যালেস্টাইন-এ রাষ্ট্রপুঞ্জর শরণার্থী শিবিরের মুখ্য আধিকারিক প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বলেন যে ইজরায়েলী সেনাবাহিনী সদর কার্যালয়ে প্রতি মুহূর্তে হাসপাতাল সহ অন্যান্য অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান জানানো সত্ত্বেও ইজরায়েলী ক্ষেপণাস্ত্র হানা এই সমস্ত লক্ষ্যবস্তুর ওপর কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

> ইজরায়েলি সেনাবাহিনী বেছে বেছে বাচ্চাদের বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং নাগরিক পরিকাঠামো সহ অসামরিক বসত এলাকায় তাদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছে।

এর ফলে গাজা অঞ্চলে অসামরিক মৃত্যু বেড়ে চলেছে দ্রুত হারে—প্রত্যুত্তরে *হামাস* এবং প্যালেস্টাইনী দেশপ্রেমিকরা কেবলমাত্র সামরিক লক্ষ্যবস্তুতেই তাঁদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে প্রথম চারদিনের যুদ্ধে ইজরায়েলী হানায় ১৬৭ জন অসামরিক প্যালেস্টাইনীর মৃত্যু ঘটলেও একজনও অসামরিক ইজরায়েলীর প্রাণনাশ হয়নি।

৩২ দিন ব্যাপী এই ইজরায়েলী আগ্রাসনে গাজার ৫০০০ বাড়ি মাটিতে মিশে গেছে, ২৬,০০০ বাড়ি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ। মৃতের সংখ্যা ১০ই আগস্ট পর্যন্ত ২০০০ ছাড়িয়েছে, শহরের পরিকাঠামোর ৭৫ শতাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ। ইজরায়েলী ট্যাংক-এর আক্রমণে শহরের একমাত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রটির গুরুতর ক্ষতি হয়েছে। পানীয় জল সরবরাহ ব্যাহত, হাসপাতালে ওষুধ এবং অন্যান্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের হিসেব মতো ৫-৮ হাজার মানুষ গুরুতর আহত, ৮৫ হাজার মানুষের দীর্ঘ চিকিৎসার প্রয়োজন, প্রায় ৫০০০ নিখোঁজ এবং ২,৫০,০০০-৩,০০,০০০ মানুষ রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণার্থী শিবিরের আশ্রয়ে থাকছেন (১০ই আগস্ট, ২০১৪)। মৃত-আহতদের ৮০ শতাংশ অসামরিক জনগণ। মৃতদের মধ্যে ৩১ শতাংশ শিশু।

এই লেখা যখন ছাপতে যাচ্ছে তখন শুধুমাত্র গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েল ১৩,০০০ বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে, ঐ অঞ্চলে প্রতি দশ মিনিটে একটি বড়ো বিস্ফোরণ ঘটছে এবং প্রতি ৫ মিনিটে একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। গত ১২ বছরে ইজরায়েলের নিজের হিসেব মতো "প্যালেস্টাইনী সন্ত্রাসবাসীদের হাতে" ৪০ জন ইজরায়েলী নিহত হয়েছেন— এদের মধ্যে ৩২জন সামরিক অফিসার; আর শুধুমাত্র এই এক মাসের ইজরায়েলী হানাতে ২০০০ জন প্যালেস্টাইনীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে কমবেশি ১৬০০ জন অসামরিক জনতা।

বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়া

এই বর্বর ইজরায়েলী আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর জনমত প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। রাষ্ট্রীয় স্তরে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়ায় মার্কিন দেশ এবং বকলমে রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং, দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশ ভারত। ভারত আজ পর্যন্ত ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো নিন্দাসূচক প্রস্তাব পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। মোদী সরকার দিল্লী দখলের আগেই, সেই প্রথম এনডিএ সরকারের সময় থেকেই এদেশ ইজরায়েলের সঙ্গে অস্ত্র ব্যবসা চালাচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় স্তরে ইজরায়েলের বন্ধু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাভারকারের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মোদী সরকার সহ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ তার মুসলমান-বিরোধী অবস্থান থেকে ইজরায়েলের সমর্থক। মার্কিন মুখপাত্র জন কেরি প্রকাশ্যেই বলেন, "*হামাস* সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইজরায়েলের যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার রয়েছে এবং ইজরায়েলের এই যুদ্ধ তৎপরতায় মার্কিন সরকারের সমর্থন রয়েছে।"

কিন্তু পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চালিয়েই যাচ্ছেন। ইজরায়েলের আগ্রাসনের প্রতিবাদে চিলি এবং পেরু— এই দুই দেশ ইজরায়েল থেকে তাদের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বিক্ষোভের প্রচণ্ডতায় লন্ডন, আয়ারল্যান্ড-এর শহরগুলো, মার্কিন দেশের প্রায় প্রতিটি বড় শহর, জার্মানি-ফ্রান্স থেকে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া থেকে আঙ্কারা কম্পমান। আমাদের দেশেও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই বিক্ষোভে সামিল। খোদ ইজরায়েলও এই বিক্ষোভের মুখে পড়েছে। তেল-আভিভ শহরের বাণিজ্যিক

এলাকায় ৩০০০ জন ইজরায়েলী (ইহুদি) জনগণ জমায়েত হয়ে গাজার গণহত্যার প্রতিবাদ জানান (২৮.৭.১৪)। এর পরদিন তেল-আভিভের রাস্তায় বিক্ষোভকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০,০০০। এই মিছিলে স্লোগান ওঠে, "যুদ্ধের প্ররোচনা দেওয়া সরকারের আমাদের প্রয়োজন নেই।" উত্তর ইজরায়েলের উম-আল-ফাহাম অঞ্চলে প্রায় ৪০০০ বিক্ষোভকারীর জমায়েতে নেতানাইহু সরকারকে গণহত্যার জন্য ধিক্কার জানানো হয়। ইজরায়েলের আল-আমারি শহরে ১৫,০০০ মানুষের বিক্ষোভ মিছিল হয়। এই মিছিলে ইজরায়েলী সৈন্যরা গুলি চালিয়ে একজন বিক্ষোভকারীকে হত্যা করে। সারা পৃথিবীতে আর একটি মাত্র দেশের মানুষ ইজরায়েলের গাজা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী মানুষ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন— সেটি আমাদের দেশ ভারত। ইজরায়েল বিরোধী বিক্ষোভে সামিল হওয়া এক কাশ্মীরী তরুণ ভারতের আধা-সামরিক বাহিনীর গুলিতে শহিদ হন।

পৃথিবী বিখ্যাত ইজরায়েলী সঙ্গীতকার এবং বৃন্দবাদন পরিচালক ড্যানিয়েল ব্যারেনবোয়াম ইজরায়েলে বসবাস করেই ইজরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একজন প্রতিবাদকারী। ইতিপূর্বে তিনি গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাংকে ইজরায়েলী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছেন। ইজরায়েলের বর্তমান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বিশ্ব জনমত গঠনের আহ্বান জানান। সারা বিশ্বের ১০০ জন চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা, গায়ক, বাদক এবং কলাকুশলী এই হামলার প্রতিবাদে সামিল হন। মার্কিন দেশে জেরুজালেম ফিল্ম উৎসবের মঞ্চকে তাঁরা এই প্রতিবাদের স্থান হিসেবে বেছে নেন।

অত্যন্ত মান্য বিজ্ঞান-পত্রিকা *ল্যানসেট*-এ বিশ্বের ২৫ জন বিজ্ঞানী ইজরায়েলের এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সরব হন।

'হামাস সন্ত্রাস' বিশ্বের মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় ইজরায়েল বর্তমানে 'হামাসের সুড়ঙ্গ যুদ্ধ'-র তত্ত্ব আমদানি করেছে। বোমা বর্ষণের উদ্দেশ্য নাকি 'হামাস-এর গুপ্ত সুরঙ্গ' ধ্বংস করা। যদিও যুদ্ধের শুরুতে এই সুড়ঙ্গের কথা শোনা যায়নি।

ইজরায়েলী সেনারা নাৎসি বর্বরতা আয়ত্ব করেছে। তারা নির্বিচারে গৃহপালিত পশুদের হত্যা করছে, খেত-খামার ধ্বংস করছে, শস্যভাণ্ডারে আগুন লাগাচ্ছে, ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। এর প্রত্যেকটি কাজই যুদ্ধাপরাধের আওতায়— কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ ইজরায়েলের পরিবর্তে হামাসকে সংযত হওয়ার উপদেশ বিতরণ করছে।

ইজরায়েল ঃ আগ্রাসনের কৃষ্টি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ মদতে আরব জনতার ওপর খরবদারির জন্য ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ইহুদিদের জন্য একটি 'হোমল্যান্ড' তৈরির পরিকল্পনা মতো ইজরায়েল রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। এজন্য প্যালেস্টাইন-এর ওপর আগ্রাসন চালিয়ে সেখানকার ৭৫ হাজার অধিবাসীকে বিতাড়িত করে সেই স্থলভাগ দখল করে ইজরায়েলের মূল ভূখণ্ড নির্মিত হয়। প্যালেস্টাইনীরা এই আগ্রাসন বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি। যে ১০,০০০ জন প্রতিবাদী মানুষ তাঁদের ভিটেমাটি ছাড়তে অস্বীকার করেন, তাঁদেরকে স্রেফ হত্যা করে (যা নাৎসি

ইজরায়েলী আগ্রাসনে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ড

সাদা অংশ ইজরায়েল অধিকৃত, ধূসর অংশ প্যালেস্টাইন

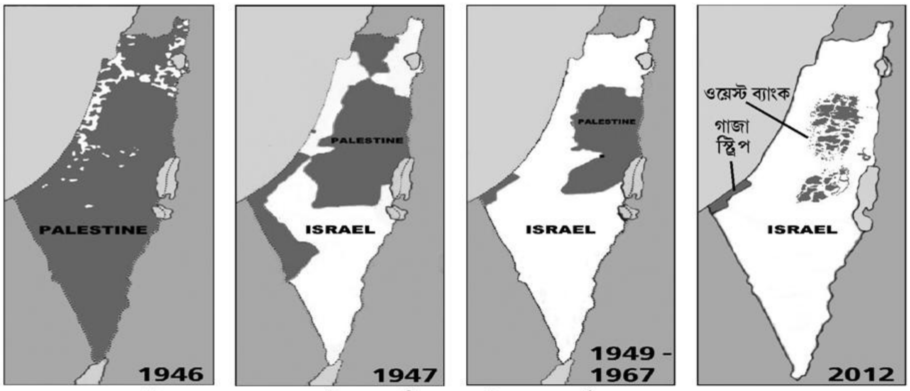

১৯৪৬ : প্যালেসটাইনে ইহুদিদের পুনর্বাসন শুরু | ১৯৪৭ : রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রস্তাবিত ইজরায়েল রাষ্ট্র | ইজরায়েল কর্তৃক ক্রমাগত প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড দখল | চিত্র : ২০১২

গণহত্যার চেয়ে কিছু কম নৃশংস নয়) সেইসব জমিও দখল করে ইজরায়েল রাষ্ট্রটি গড়ে ওঠে। ঘটনার সময়কাল ১৯৪৬-১৯৪৭।

প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক সীমানা ইজরায়েলী আগ্রাসনে ক্রমাগত কমে আসছে। প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যা ৪৫ লক্ষ (কিন্তু এর চেয়ে বেশি প্যালেস্টাইনীয় প্রতিবেশী দেশগুলিতে উদ্বাস্তু জীবন যাপন করেন এবং বেশ কিছু প্যালেস্টাইনী বাস করেন ইজরায়েল অধিকৃত ভূখণ্ডে— দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে)। এছাড়া প্যালেস্টাইনে বসত গড়েছেন সাড়ে পাঁচ লক্ষ ইজরায়েলী ইহুদি পুনর্বাসিত মানুষ বা সেটলার। গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাংক মিলে দেশটির আয়তন ৬ হাজার বর্গমাইলের কিছু বেশি। যা আয়তনের দিক থেকে আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার চেয়ে কিছু বেশি। লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ। দেশ হিসাবে ধরলে জনঘনত্ব সারা বিশ্বে সর্বোচ্চ। গাজার অবস্থা আরও শোচনীয়। এই ভূখণ্ডে ২০০ বর্গমাইলে বাস করেন ১৮ লক্ষ প্যালেস্টাইনী।

আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে ১৯৬৭ সালে আরব দুনিয়ার বিরুদ্ধে ছ'দিনের বিখ্যাত আগ্রাসী যুদ্ধে ইজরায়েল প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ড ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, পূর্ব জেরুজালেম, গাজা দখল করার পাশাপাশি আরব রাষ্ট্র সিরিয়ার গোলান হাইট্স দখল করে নেয়। তারপর প্রতিবছরই ইজরায়েল মার্কিন, ইংল্যান্ড এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের মদতে তার আগ্রাসনের পরিমাণ এবং তীব্রতা ক্রমশ বাড়াতে থাকে এবং গাজা ভূখণ্ড সহ সমগ্র প্যালেস্টাইনকে একটি বন্দিশিবিরে পর্যবসিত করে। সারা বিশ্বে নাগরিকত্বহীন মানুষ প্যালেস্টাইনে সবচেয়ে বেশি— ইজরায়েলী আগ্রাসনে তারা রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিচালিত শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় পেয়েছেন।

সমীক্ষায় জানা যায় যে গাজা ভূখণ্ডে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই খবর জানার পর ইজরায়েলকে আর গাজা আক্রমণের জন্য দুবার ভাবতে হয়নি।

আগ্রাসনের পেছনে আসল মতলব

সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন, যে কোনো আগ্রাসনের পেছনে থাকে অর্থনৈতিক কারণ— রসদ দখল এবং বাজারের প্রসারণের উদগ্র চাহিদা। ইজরায়েলও এর থেকে মুক্ত নয়। দেশের শাসকরা যখন রাজ্য চালাতে গিয়ে গণবিক্ষোভের ফলে দিশাহারা হয়ে পড়ে, তখন তাদের অন্যতম বাঁচার রাস্তা হয় যুদ্ধ।

ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির হাল শোচনীয়। ১৯৯৫ থেকে ২০১১— এই ১৬ বছরে ইজরায়েলে জাতীয় আয়ে শ্রম এবং শ্রমিকের অবদান কমেছে— ফলে শ্রমিকদের আসল মজুরি কমেছে শোচনীয়ভাবে। ইজরায়েলের ১৯ শতাংশ নাগরিকের দারিদ্র্য সাব-সাহারা আফ্রিকার সঙ্গে তুলনীয়। আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য মারাত্মক। জিনি সহগের প্রেক্ষিতে ইজরায়েল দেশটিতে অসাম্য ভয়াবহ। ইজরায়েলের ৫০০টি ধনী পরিবারের ঐশ্বর্য গত এক দশকে বেড়েছে তিনগুণ। যখনই দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিক বিক্ষোভ, কর্মচারী বিক্ষোভ বেড়েছে, তখনই ইজরায়েলের নেতারা 'ইহুদি বাঁচাও' স্লোগান তুলে জায়নবাদী জিগিরে দেশকে প্লাবিত করে প্যালেস্টাইন আক্রমণ করে এবং যুদ্ধের দোহাই দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে। ১৯৬৭-২০১৪ এই দীর্ঘ সময়কালে এই ছকের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইজরায়েল রাষ্ট্রটির চরিত্রই যা, তাকে তথাকথিত শান্তি বজায় রাখার জন্য নিরন্তর যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়।

দেশটিতে মাথাপিছু শক্তি খরচের হার অসম্ভব রকমের বেশি। তাকে বকলমে মার্কিন দেশ থেকে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে হয়— শক্তি সমস্যায় সে দেশ এখনই পীড়িত। এমন অবস্থায় মার্কিন এবং বৃটিশ সংস্থা ব্রিটিশ গ্যাস-এর সমীক্ষায় জানা যায় যে গাজা ভূখণ্ডে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই খবর জানার পর ইজরায়েলকে আর গাজা আক্রমণের জন্য দুবার ভাবতে হয়নি। ২০০০ সালের সমীক্ষা অনুসারে গাজা-র 'অফ-শোর' অংশে নিশ্চিতভাবে ১.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। ইজরায়েলকে যদি আগামী কয়েক বছর ধরে এই পরিমাণ গ্যাস বাজার থেকে কিনতে হয় তবে তার জন্য কম করে ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার খরচ করতে হবে। অন্যদিকে, ইজরায়েল যদি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের বর্তমান হারও বজায় রাখে, তবে তাদের নিজস্ব প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডার বড়জোর আর বছর তিরিশেক চলতে পারে।

অতএব ইজরায়েলের পক্ষে গাজা দখলের এমন অর্থনৈতিক স্বার্থকে ভুললে চলবে না— বস্তুত ইজরায়েলের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ দেখলে বরং এমন ভাবার কারণ রয়েছে যে এই স্বার্থের কারণেই সে গাজা আক্রমণ করেছে। ইজরায়েল যদি গাজার এই প্রাকৃতিক গ্যাসভাণ্ডারের দখল পায়, তবে সে বিশ্বের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবসায় একজন মুখ্য অংশীদার হয়ে উঠবে এবং বিশ্বের বাজারে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম নির্ধারণে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। সেক্ষেত্রে ইজরায়েল তার নিজের শক্তির চাহিদা মিটিয়েও আগামী এক দশকে বছরে ৬-৭ মিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য করতে পারবে।

ইজরায়েলের এই মতলব পরিষ্কার হয় তাদের সরকারের একটি প্রকাশ্য ঘোষণায়। ২০০৭ সালে একটি রেডিও সাক্ষাৎকারে একজন সরকারি মুখপাত্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেন যে, গাজা থেকে *হামাস* সহ অন্যান্যদের সম্পূর্ণ উৎখাত করতে না পারলে গ্যাস উত্তোলনের কাজটাই শুরু করা যাচ্ছে না। গাজা

দখলে ইজরায়েলের লাভ দুদিক থেকেই। এক, তারা গাজার প্রাকৃতিক গ্যাসভাণ্ডারের পুরোটারই দখল পারে। দ্বিতীয়ত, গাজা দখল করে সেখানকার অধিবাসীদের উচ্ছেদ করতে পারলে ইহুদি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের হাতে বাড়তি ৩৬৫ বর্গ কিমি পরিমাণ জমি আসবে, যা বসতবাড়ি-বাগানবাড়ি, গলফ কোর্স-হোটেল ইত্যাদি নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। এছাড়াও ভূমধ্যসাগরের দিকে উপকূল বরাবর ৪১ কিমি দৈর্ঘ্যের একটি সরেস জমিও হাতে আসবে। ৩৬৫ বর্গ কিমি জমির রিয়েল এস্টেট মূল্য আকাশ ছোঁয়া— হাজার বিলিয়ন বা তারও বেশি। তবে ইহুদি ব্যবসায়ীদের হিসেব মতো, ৪১ কিমি ফালি জমির জন্য কিমি প্রতি ১০ বিলিয়ন ডলার দাম পড়বে!

২০১৩ সালেই ইজরায়েল ঘোষণা করেছে যে ২০১৭ সালের মধ্যে ফ্রান্স থেকে ইজরায়েলে আসতে প্রত্যাশী ৪২ হাজার ইহুদিকে তারা ইজরায়েলে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেবে। জায়নবাদ-বিরোধী ইহুদিরা ইজরায়েল ত্যাগ করায় ইজরায়েল রাষ্ট্রটি ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে মান্যতার সমস্যায় পড়েছে— সেটি সামাল দিতে তাদের এখন অস্ত্রের সঙ্গে মানুষ আমদানির এই আয়োজন। ইজরায়েলে আসতে ইচ্ছুক মানুষদের সম্ভাব্য বাসস্থান হিসেবে ভাবা হচ্ছে গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাংক-এর অধিকৃত অঞ্চলগুলি।

কিন্তু ২০০৬ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে গাজায় *হামাস*-এর প্রভাব বাড়ায় এবং *ফাতা*-র সঙ্গে *হামাস*-এর সমঝোতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইজরায়েল বুঝতে পারে যে গাজার প্রাকৃতিক গ্যাসের দখল এবং মুনাফার পুরোটা সে পাবে না।

২০০৮ সালে যখন বৃটিশ গ্যাস এবং ইজরায়েলের মধ্যে গ্যাস চুক্তি চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হয়, তখন গাজা থেকে *হামাস*-কে উচ্ছেদের জন্য ইজরায়েল 'অপারেশন কাস্ট লিড' নামে এক সামরিক আগ্রাসন চালায়। এর ফলে ১৪১৭ জন অসামরিক প্যালেস্টাইনী নাগরিক মারা যান, ৪০০০টি বাস্তুভিটে মাটিতে মিশে যায়, ৫০০০০ জন মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়; এবং বলাই বাহুল্য, ইজরায়েল এই ছেড়ে যাওয়া ভূখণ্ডের দখল নেয়। এর পাশাপাশি ইজরায়েল, *হামাস*-বিরোধী প্যালেস্টাইন গোষ্ঠী *ফাতা*-কে লাইট মেশিনগান সহ অন্য অস্ত্র সরবরাহ করে *হামাস*-বিরোধী যুদ্ধে তাদের উদ্বুদ্ধ করে।

বাবা-বুশ এবং খোকা-বুশ যখন ইরাক যুদ্ধ শুরু করেছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে, তখন একটি বিখ্যাত কার্টুন ছিলো, যার তলায় লেখা থাকত, 'ওরে বুদ্ধু, এই যুদ্ধ জ্বালানি তেলের জন্য!' সেই প্রতিধ্বনিতে বলতে পারি যে, বর্তমান গাজা দখলের যুদ্ধ আসলে প্রাকৃতিক গ্যাস আর জমি দখলের যুদ্ধ— একথাটা যেন আমরা বিস্মৃত না হই! বিশ্বায়নের বর্তমান যুগে মার্কস-বর্ণিত আদিম পুঞ্জীভবন নতুন রূপে আবির্ভূত— তা আকৃতিতে যতই নতুন দেখতে হোক না কেন, মর্মবস্তুতে তা একই।

অনীক ৫০ বছর :
নির্বাচিত রচনা সংকলন

প্রথম খণ্ড : ১৯৬৪-১৯৭২ ১৮০

দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯৭২-১৯৭৫ ২৫০

প্রকাশের অপেক্ষায়

তৃতীয় খণ্ড : ১৯৭৭-১৯৮২

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০১৫

সম্ভাব্য মূল্য : ২০০ টাকা

ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রাহক হলে বিশেষ মূল্য ১৫০ টাকা

গ্রাহকদের বকেয়া চাঁদা অবিলম্বে পরিশোধ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে

পাট-চিত্র

অরিজিৎ

গত ১৫ই জুন হুগলীর ভদ্রেশ্বরের নর্থ ব্রুক জুট মিল-এ শ্রমিক বিক্ষোভের ফলশ্রুতিতে মিলের সিইও হরিকিষাণ মহেশ্বরীর গণপিটুনিতে মৃত্যু হওয়ায় পাটশিল্প নিয়ে নানান মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দেওয়া, এমন ঘটনা ঘটতে থাকলে এখানে বিনিয়োগকারীরা আসবে না ইত্যাদি নিয়ে যত আলোচনা বাড়ছে ততই অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে শ্রমিকদের বঞ্চনার ইতিহাস, দুর্বিষহ জীবনকাহিনী আর শিল্পটির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনার সূত্রগুলো।

পাটশিল্প বাংলার একটি শতাব্দী-প্রাচীন শিল্প। নর্থব্রুক কারখানাটিও একশো বছরের বেশি পুরানো। স্বাধীনতার পরেই দেশভাগের হাত ধরে বড়সড় আঘাত নেমে আসে এই শিল্পটির ওপর— পাটচাষের বেশিরভাগটাই ছিল পূর্ববঙ্গে আর কারখানাগুলো পশ্চিমবঙ্গে। সে ধাক্কা সামলালেও ক্রমবর্ধমান প্লাস্টিকের ব্যবহার পাটের গুরুত্বকে কমিয়ে দিতে থাকে; কিন্তু তাতেও সমস্যা ছিল না, কারণ চটের থলির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্রেতা ছিল সরকার, আর খাদ্যদ্রব্য ও দানাশস্য মজুত করার ব্যাপারে প্লাস্টিকের ব্যাগের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাও ছিল। কিন্তু প্লাস্টিক লবির চাপে জুট লবি ক্রমাগত কোণঠাসা হতে থাকে গত দু-তিন দশকে। তার সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর পাটজাত সামগ্রীর রপ্তানিও কমে গেছে। বলা ভালো শিল্পটি প্রাসঙ্গিকতা না হারালেও বহুলাংশে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। 'রুগ্ন শিল্প' সরকারি ঘোষণার সাইনবোর্ড টাঙিয়ে শুরু হয় নির্লজ্জ মালিকি লুঠ। মুনাফার হার বজায় রাখতে মালিকের ইচ্ছেমতো (বলা ভালো প্রতি বছরই নিয়মমাফিক দু-তিন মাস) কারখানা বন্ধ থাকে। কখনও কারখানা চালু হয় সপ্তাহে কাজের দিন কমিয়ে। অতিরিক্ত বেতন ব্যতিরেকে কাজের সময় বাড়িয়ে ১০/১১ ঘণ্টা করে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের শেয়ারের নাম করে বেতন কাটা, বকেয়া বেতন, গ্র্যাচুইটি ও পিএফ-এর টাকা মেরে দেওয়া, কাটৌতি কিংবা ভাউচার প্রথা— সব চলে। এর তালে তাল মিলিয়ে চলে সিটু, বিএমএস, আইএনটিটিইউসি-র মতো দালাল ইউনিয়নগুলো। এদের নেতারা কারখানা শ্রমিকদের বুঝিয়ে আসছে দিনের পর দিন— কারখানার হাল খারাপ, আন্দোলনের পথে হাঁটলে মালিক মিল বন্ধ করে দেবে, তখন আর কোনো রুটি রুজি থাকবে না। এর সাথে আছে ফড়ে-দালালদের রমরমা— শুধু শ্রমিকদের নয়, পাটচাষিকেও সর্বস্বান্ত করে তারা। আর কারখানা জুড়ে বিরাজ করে গুন্ডারাজ।

উপরের এ সাধারণ ইতিহাস মোটামুটি সকলের জানা। নর্থব্রুকের পরিস্থিতিটাও আলাদা কিছু নয়। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত মিলটি বন্ধ থাকার পর মালিক ও শ্রমিকের যৌথ মালিকানার প্রতিশ্রুতিতে (৪৯ শতাংশ মালিক আর ৫১ শতাংশ শ্রমিকদের শেয়ার থাকবে) খোলে— সেই অনুযায়ী শ্রমিকরা অর্ধেক মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। সেই মতো তিনবছর অর্ধেক পারিশ্রমিকে কাজ চলার পর মালিকানার হস্তান্তর হয়। নতুন মালিক আসে কিন্তু শ্রমিকদের মালিকানার শর্ত অনুযায়ী কোনো কিছুই পায় না তারা— না কোনো সুবিধা, না কোনো আর্থিক প্রতিদান। বর্তমানে কারখানাটিতে প্রায় ৫০০০ শ্রমিক কাজ করে— যার মধ্যে ৩০০০ জন স্থায়ী, বাকিরা অস্থায়ী। স্থায়ীরা পায় দৈনিক ৪৭৫ টাকা আর অস্থায়ীরা ১৫৭ টাকা করে। অস্থায়ীরা মেরে-কেটে মাসে দশ-বারো দিন কাজ পায়। স্থায়ী কাজেও যে নিশ্চয়তা আছে তা নয়। কখনো ৩ ঘণ্টার শিফ্‌টের কাজ দেখিয়ে পুরো কাজ করিয়ে অর্ধেক বেতন দেওয়া হয়। কখনো বাধ্যতামূলক ওভারটাইম করা হয়, কখনো বা দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ১১ ঘণ্টা করে নেওয়া হয় ইউনিয়নের নেতা আর সরকারপক্ষের সাথে আঁতাত করে। কখনো সপ্তায় ৩ দিন কাজ খাতায় কলমে বন্ধ রেখে একশো/দেড়শো টাকা হিসেবে ভাউচারে সই করিয়ে উৎপাদন করানো হয়। গোডাউনে প্রচুর মাল জমে যাওয়ার জন্য সপ্তাহে তিনদিন কাজ বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করে মালিকপক্ষ— যা থেকে এবারের গন্ডগোলের সূত্রপাত।

অবসরপ্রাপ্তদের প্রাপ্য টাকা মেটানোর পদ্ধতিটাও অদ্ভূত; পুরো টাকা আদায় করতে অন্তত দশ বছর লেগে যায়। ভিন রাজ্যের বয়স্ক শ্রমিকরা দু-তিন বছর অন্তর বারবার এখানে আসেন দু-এক মাস হাতে সময় নিয়ে— তদ্বির-তদারক ক'রে কিস্তির টাকা উদ্ধার করতে, খালি হাতে ফিরেও যেতে হয় অনেকক্ষেত্রে। কলোনিতে সত্তরোর্ধ্ব অনেক মানুষ আছেন যাঁরা এখনো তাঁদের প্রাপ্য টাকা পান নি, আর তার মধ্যে মারা গেলে তো মালিকের পোয়া বারো। পিএফ-গ্রাচুইটির টাকা নয়ছয়ের প্রচুর নিদর্শন আছে। মালিকপক্ষ মনোনীত কয়েকজনকে নিয়ে তৈরি কমিটি-সদস্যদেরই পকেটস্থ হয় সে টাকার একটা বড়সড় অংশ— এমনই অভিযোগ করেছে শ্রমিকরা। আগে ওয়েলফেয়ারের একটা ফান্ড ছিল। উৎসবে, বাড়ির অনুষ্ঠানে সেই ফান্ড থেকে টাকা মিলত। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিরও ব্যবস্থা ছিল সেই ফান্ড থেকে। তাও দীর্ঘ কয়েক বছর বন্ধ। শ্রমিক কলোনিটি ব্রিটিশ আমলের ব'লে মাঝে মাঝে কিছু ফাঁকা জায়গা আছে কিন্তু বসতির জায়গাগুলো খুবই ঘিঞ্জি, দুর্গন্ধযুক্ত এবং অস্বাস্থ্যকর। দেখলেই বোঝা যায় এ অপরিচ্ছন্নতা

শ্রমিকদের অভ্যাসগত কারণে নয়, বরং শোচনীয় নিকাশিব্যবস্থা আর জঞ্জাল সাফ করার সরকারি ব্যবস্থার গাফিলতির জন্য। কোয়ার্টারগুলো জরাজীর্ণ, কোথাও ছাদ ফেটে জল পড়ছে, বট-অশ্বত্থ বেরিয়েছে দেওয়ালের গা থেকে, জানলা দরজা ভেঙে পড়ছে, অন্ধকার এবং স্যাঁতস্যাঁতে। বিদ্যুতের লাইন আছে, কিন্তু তা গৃহস্থ বাড়ির হারে নয়; বিদ্যুৎ সংযোগ যেহেতু হয়েছে কারখানার কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে, বাণিজ্যিক হারে দাম দিতে হয় শ্রমিকদের— ইউনিট প্রতি ৯ টাকা; তাও দুপুরে ১২টা থেকে ২টা আর সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ২টা অবধি। বাকি সময় কারখানা থেকেই কলোনির বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়, এমনকি প্রখর গরমেও। এবছরই যখন 'লোডশেডিং মুক্ত' বাংলা নিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি লাফালাফি করেছে সেই সময়ই বাংলার শ্রমিকরা কী অবস্থায় ছিল তার খবর কেউ রাখেনি।

পানীয় জলের প্রয়োজনমত সংস্থান নেই। খুব ধীরে জল পড়ে কলগুলো দিয়ে; সাপ্লাই লাইনে বহু জায়গায় ফাটাফুটো দিয়ে জল বেরিয়ে যায়; কোথাও কল ভেঙে গেছে, নলের মুখে ইঁট চাপা দিয়ে জল নষ্ট বাঁচায় শ্রমিকরা— সেগুলো কবে যে সারাই হবে তা অজানা। ইতঃস্তত ছড়ানো কিছু শৌচাগার আছে যা অপ্রতুল, ভীষণ খোলামেলা— আব্রু বলে কিছু থাকে না। একটা ঘেরা জায়গায় টানা নর্দমার ওপর কিছু পাদানি বসানো। ময়লা সেই নর্দমাতেই জমে থাকে, খুব একটা প্রবাহিত হয় না। সপ্তাহে একবার পরিষ্কার হয়। কী রকম দুর্গন্ধ হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেখানেও বিদ্যুৎ সংযোগ থাকে না, তার ওপর ছাদ খসে পড়ে দুর্ঘটনার নজিরও আছে শৌচাগারে। কলোনির মধ্যে যে কটা পুকুর ছিল, লোকে স্নানাদি করত সেগুলোও কচুরীপানায় ঢেকে আছে কয়েক বছর। গঙ্গার জলের প্রবাহের সাথে সংযোগ ছিল একটা পুকুরের— সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ হাজার শ্রমিকের কলোনিতে একটাই প্রাথমিক স্কুল, মাত্র দুটো ঘর, একজন শিক্ষক। তাও সেটা খোলা হয় না। স্কুলের সরকারি শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ কারখানার কেরানিবৃত্তিতে নিয়োগ করেছে। এককথায় বলতে গেলে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকারের দেশে এরকম অসংখ্য শ্রমিক পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। কারখানা কিংবা কলোনির মধ্যে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এমনকি ফার্স্ট এড-এরও কোনো ব্যবস্থা নেই। কিছু হলে দৌড়তে হয় নিকটবর্তী ইএসআই-তে। এখন নিয়ম জটিল হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট হোক কিংবা কোনো অসুখ— বর্তমান ইন-চার্জ আগে দেখে যদি ঠিক করেন যে তার চিকিৎসার প্রয়োজন আছে, তবেই সে চিকিৎসার খরচের অংশ পাবে। অর্থাৎ মিল চলাকালীন কেউ আহত হলে তাকে ডাক্তারখানায় দৌড়ানোর আগে হত্যে দিতে হবে কর্তৃপক্ষের সই-এর জন্য। আর অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু হলে দেহ গায়েব করে দেওয়ারও অতীত উদাহরণ আছে প্রচুর। মৃত্যুতে প্রাপ্য আর্থিক ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করতেও কালঘাম ছুটে যায়।

কারখানার জমির একাংশ বেচে দিয়ে তাতে ফ্ল্যাট হয়েছে, রোখা যায়নি। এক অংশ লিজ দেওয়া হয়েছে 'টোটো' গাড়ি তৈরির জন্য। গঙ্গার ধারে কোম্পানির একটা লোহার জেটি ছিল, যেটা বর্তমান মিল মালিক বেচে দিয়েছে বলে শ্রমিকরা অভিযোগ জানিয়েছে।

নর্থ ব্রুকের সিইও হরিকিষাণ মাহেশ্বরী যে গণপিটুনিতে মারা গিয়েছে তার ব্যাপারে মালিকপক্ষ এবং মিডিয়া দুজনেই প্রচার চালিয়েছে যে সে নাকি শ্রমিকদরদী। শ্রমিকরাও তাকে ভালোবাসে। মিল মালিক প্রকাশ চুরারিয়া এমনও জানিয়েছে যে মিলের শ্রমিকরা বা কোনো ইউনিয়ন এ ঘটনার সাথে যুক্ত নয়। বহিরাগত দুষ্কৃতিরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে; কোনোরকম তদন্ত ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন সিপিএম এবং বিজেপি পরিচালিত ইউনিয়ন সিটু আর বিএমএস একত্রে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। শ্রমিকরা কিন্তু অন্য কথা বলছে— মিলের মধ্যে সিইও সারাক্ষণই কোমরে রিভলবার নিয়ে দাপটের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত এবং 'আমার চেয়ে এ মিলে বড় গুন্ডা আর নেই' — একথা মাঝে মাঝেই শোনা যেত ঔদ্ধত্যের সুরে। ঘটনার দিন শ্রমিকরা বাইরে বিক্ষোভ করছিল সপ্তাহে তিনদিন মিল বন্ধ রাখার সাময়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। সে সময় হঠাৎ সিইও বাইরে বেরিয়ে আসে এবং নিজেই শ্রমিকদের চড় থাপ্পড় মেরে ধস্তাধস্তি শুরু করে। আসন্ন বঞ্চনার আশঙ্কায় ক্ষিপ্ত শ্রমিকরা দীর্ঘদিনের জমে থাকা ঘৃণা উগরে দেয় তার ওপর। তাকে শিক্ষা দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল, খুন করার কোনো মানসিকতা ছিল না, পূর্বপরিকল্পনা তো দূরের কথা। কিন্তু পরিস্থিতি আর নিয়ন্ত্রণে থাকে নি।

চটকলগুলো মালিকশ্রেণীর মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। বর্তমানে নর্থব্রুক কিংবা অতীতের বরানগর জুটমিল বা লুমটেক্স জুটমিলের সিইও বা পার্সোনাল ম্যানেজারের খুনের ঘটনা নিয়ে জলঘোলা হলেও শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে মুখ খোলে না কেউই।

২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে জুটমিলে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৩৮, প্রতি বছর গড়পড়তা প্রতি ২০ জন শ্রমিক পিছু ১ জন গুরুতর রকমের আহত হয়, এবং সেটা মূলত পুরনো মেশিনের জন্যই। ক্রেতা যখন একমাত্র সরকার, কোনোরকমের প্রতিযোগিতা নেই, তখন আর আধুনিকীকরণের তাগিদ অনুভব করে না মালিক। খুবই পরিচিত ধরনের দুর্ঘটনা হলো আঙুল কেটে বাদ চলে যাওয়া— আর এরকম আহতের সংখ্যা দশ হাজারের ওপর।

দুর্ঘটনার আর একটা বড় কারণ কাজের সাপেক্ষে শ্রমিক সংখ্যা। নব্বই দশকেও একটন পাটের প্রসেসিং-এ ৬৫ জন শ্রমিক ছিল, যে সংখ্যাটা বর্তমানে ২০-২২। অর্থাৎ তিনজনের কাজ একজনকে করতে হয়। প্রচণ্ড গরমে সারাক্ষণ আওয়াজের মধ্যে আট-দশ ঘণ্টা টানা কাজ করতে হয়, তার সাথে বাতাসে

সারাক্ষণ পাটের আঁশ উড়ে বেড়ায়। দুর্ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। তার সাথে আছে কারখানার এহেন পরিবেশের জন্য টিবি, ফুসফুসের ক্যানসার সব নানবিধ দুরারোগ্য রোগ আর কলোনির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য ম্যালেরিয়া, ডায়ারিয়া ইত্যাদি।

শ্রম আইনগুলোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চটকলের নিয়মকানুন বদলে যাচ্ছে। ৯০ শতাংশ স্থায়ী শ্রমিক রাখার নিয়মকে পূর্বতম সরকার আমলেই তুলে দেওয়া হয়েছিল। এ আমলে আরো নানান সংশোধনী চলছে এবং তা যে শ্রমিক স্বার্থের বিপক্ষেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সম্প্রতি হনুমান জুট মিলে কাজের সময় বাধ্যতামূলকভাবে ১১ ঘণ্টা করা হয় এবং ওভারটাইম কাজ করার জন্য যে দ্বিগুণ রেটে টাকা দেওয়ার নিয়ম তা-ও লঙ্ঘন করে কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকরা মে-জুনের প্রচণ্ড গরমে সে কাজ করতে গিয়ে ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাধ্যতামূলক ওভারটাইম করতে অস্বীকার করলে কর্তৃপক্ষ লক-আউটের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়।

নতুন সরকার কানোরিয়া জুট মিল খোলার কৃতিত্ব জাহির করলেও BIFR মারফত নতুন স্কীমে কারখানা খোলা হলেও অল্প শ্রমিকই কাজ পেয়েছে। তিন শিফটে কাজ হবে ঘোষণা করলেও এক শিফটে কাজ হচ্ছে, ৩৫০০ শ্রমিক নিয়োগের কথা বলে মেরেকেটে সাড়ে সাতশো কাজ পেয়েছে। শ্রমিকরা পুরানো বকেয়া পায়নি কিংবা দীর্ঘ বন্ধ থাকার সময়পর্বে যাদের অবসরের বয়স হয়ে গেছে তাদের প্রাপ্য টাকাও বিশ বাঁও জলে। পিএফ, গ্র্যাচুইটি, কাটৌতি সহ সে বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ২৫ কোটি টাকা। ২৩০০ অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক গ্র্যাচুইটির টাকা পায়নি। আর কারখানা চালানোর বরাত পেয়েছে যে পাশারি, সেও আসলে কাঁচা পাট স্টক করে রাখার সবচেয়ে বড় ফড়ে। এক কথায় যারা মিল চালানোর বরাত পাচ্ছে তাদের অন্য বড় ব্যবসা আছে, মূলত পাটের দালালিই তাদের বড় ব্যবসা; মিল চালানোর অভিজ্ঞতা বা সদিচ্ছা কোনোটাই তাদের নেই।

বিনিয়োগ যাতে পালিয়ে না যায় তার জন্য খুল্লমখুল্লা মালিক-তোষণে নেমেছে আমাদের রাজ্য— আগের জমানায় তো বটেই, এমনকি পরিবর্তনের জমানার নতুন সরকারও। শ্রম আইন-গুলোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মালিকরা শ্রমিক বঞ্চনার মাত্রা যে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে সে বিষয়ে প্রচ্ছন্ন সরকারি মদত আছে। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকগুলো মালিকপক্ষ অগ্রাহ্য করে চলে। বাস্তবিক-ভাবেই শ্রমদপ্তর ও সরকার এই ব্যাপারে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আর তার ওপর শ্রম আইনগুলো যেটুকু শ্রমিকদের স্বার্থের পক্ষে ছিল সেগুলো পরিবর্তন করে মালিকি লুণ্ঠনের পথ প্রশস্ত করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ঘটনার পর শিল্প-বাণিজ্য মহলকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য এককালের আন্দোলনের মুখ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি জানিয়েছেন 'জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন' বরদাস্ত করবেন না, এ ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নেবেন। এরপর থেকেই যাকে তাকে ধরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিকেল সন্ধ্যা থেকে রোজ মিল সংলগ্ন শ্রমিক লাইনে দলীয় গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ আনাগোনা শুরু হয়, ঘরে ঢুকে হুমকি, কাউকে টেনে বের করে নিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার করা ইত্যাদির মাধ্যমে সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি হয়েছে।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কাকে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন বলছেন? ইউনিয়নগুলোই যখন মালিকের দালালি করছে, মালিকের ইচ্ছেমতো পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য আর শ্রমিক অসন্তোষ ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মালিক শ্রেণীর হাতিয়ার হয়ে উঠে শ্রমিকদের বোঝাচ্ছে আন্দোলন করলে মিল বন্ধ হয়ে যাবে (যদিও ক'দিন আগেই বিধানসভায় পূর্বতন শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু জানিয়েছেন— ধর্মঘটে নয় বরং লকআউটেই বেশি কর্মদিবস নষ্ট হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ধর্মঘটে নষ্ট হয়েছে ৫২০২টি আর লকআউটে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ কর্মদিবস)। ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের দাবিদাওয়া জানানোর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে তাদের বিরত রেখে শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তবতাকেই ধূলিসাৎ করছে, তখন ক্ষোভ বহিঃপ্রকাশের অন্য কোনো রাস্তা থাকছে না শ্রমিকদের। আর তার সাথে সরকারের শ্রমিকবিরোধী পদক্ষেপগুলো শ্রমিকদের মধ্যে এক দিশাহীনতা সৃষ্টি করছে। শ্রমিকদের কথা শোনারও কেউ নেই, শ্রমিকদের হয়ে বলারও কেউ নেই। অসন্তোষের বিন্দুমাত্র বহিঃপ্রকাশ হলেই তাদের শায়েস্তা করতে নেমে পড়ছে সরকার, আর মালিকরা ক্যাঙারু-সন্তানের মতো সরকারের কোলে বসেই বেয়াদপির মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। এই শূন্যতা থেকে কোনো সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন তৈরি না হওয়ায় পেশীশক্তি আর নৈরাজ্যের স্পষ্ট ঝোঁক তৈরি হচ্ছে। ফলে দীর্ঘস্থায়ী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের বদলে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে শ্রমিকরা। বিগত কয়েক দশকে যেভাবে শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া তলানিতে এসে ঠেকেছে, আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে আন্দোলনের কর্মসূচি যান্ত্রিকভাবে পালন করে যাওয়া হয়েছে, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক আন্দোলনের সাথে শ্রমিকদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক দুর্বল হয়েছে, সামাজিক রাজনীতি থেকে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি বিযুক্ত হয়েছে, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের দিক থেকেও একটা আন্দোলনকে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াও স্তিমিত হয়েছে, যেভাবে সরকার, সরকারে থাকা দল, মালিকের গুন্ডাবাহিনী শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক স্বরের উপর নখ দাঁত নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে তা প্রতিহত করার স্পষ্ট কর্মসূচি নেই, গোটা সমাজ জুড়ে বিরাজ করছে প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশ— যার ফলে এই মুহূর্তে শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা। আপাতভাবে কোনো সংগঠিত আন্দোলন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু অন্তর্বস্তুতে সে আন্দোলন গড়ে ওঠার উপাদান নিশ্চিতভাবেই আছে।

ঘটনাপ্রবাহ

উত্তরের চা-বাগান : উত্তরের অপেক্ষায় শ্রমিক

সুমন গোস্বামী

চা। চা-বাগান। আবারও একবার সংবাদের শিরোনামে। ডুয়ার্সের চা-বাগানে অপুষ্টি-অনাহারজনিত মৃত্যু গত বারো-চোদ্দ বছরের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সংখ্যা ও ভয়াবহতার বিচারে যদিও গত দু'বারের তুলনায় এবারের মৃত্যুমিছিল অনেকটাই দুর্বল। তবুও মৃত্যু যে হয়েছে, হচ্ছে— এটা ঠিক এবং সেই মৃত্যুর প্রধানতম কারণ অনাহার/অর্ধাহার— এও সত্যি। কিন্তু আমাদের বর্তমান খোঁজ এই অনাহার মৃত্যুজনিত বিষয় নয়। বরং একই সময়ে অপর এক ঘটনাও যে সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে, সেটি। ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা-বাগানগুলিতে ক্রিয়াশীল প্রায় সবগুলি ইউনিয়ন এককাট্টা হয়েছে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্দিষ্টকরণের দাবিতে। কমবেশি ৩০টি ইউনিয়নের দাবি দৈনিক ২৮৫ থেকে ৩৩৩ টাকা মজুরির। পক্ষান্তরে মালিকপক্ষ তিন বছরের চুক্তির ভিত্তিতে দৈনিক সাত টাকা করে বাড়াতে চাইছে। অর্থাৎ বর্তমান মজুরি দৈনিক ৯৫ টাকা প্রথম বছরে বেড়ে হবে ১০২ টাকা। এবং চুক্তির তৃতীয় বছরে তা দাঁড়াবে ১১৬ টাকায়। একের পর এক ত্রি-পাক্ষিক বৈঠক হচ্ছে, এবং ব্যর্থ হচ্ছে। এই পরিসরে আমরাও খুঁজে দেখতে চাচ্ছি, সত্যিই কি চা-শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধির কোনও অবকাশ আছে? থাকলে কতটা?

প্রধানত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার 'মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট' লাগু করেছিল। মিনিমাম ওয়েজ বা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের একটি সর্বজনগ্রাহ্য ফর্মূলা গৃহীত হয় ১৯৫৭ সালের লেবার কনফারেন্স-এ। কনফারেন্সে গৃহীত ফর্মূলা অনুসারে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় থাকতে হবে :

ক) প্রতি প্রাপক পিছু তিনজন ভোক্তা (দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক ও দু'জন অপ্রাপ্তবয়স্ককে একটি ইউনিট ধরে) ধরতে হবে;

খ) গড় ভারতীয় ব্যক্তির প্রাত্যহিক ন্যূনতম পুষ্টির চাহিদা ২৭০০ ক্যালোরি। অর্থাৎ প্রাপক পিছু ৮১০০ ক্যালোরি খাদ্যের মূল্য ধরতে হবে;

গ) পরিবার পিছু বার্ষিক ৭২ গজ কাপড়ের মূল্য যুক্ত হবে;

ঘ) সরকারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউজিং স্কিম অনুসারে ভাতা যুক্ত হবে;

ঙ) জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য খাতের জন্য ন্যূনতম মজুরির ২০ শতাংশ বরাদ্দ থাকতে হবে।

এরপর ১৯৯২ সালে এক যুগান্তকারী রায়ে (রেপটাকোস অ্যান্ড কোং বনাম কর্মীবৃন্দ) মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বলেন, সন্তানের পড়াশোনা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিনোদন, বিবাহ প্রভৃতির জন্য অন্তত ২৫ শতাংশ সুনিশ্চিত করতে হবে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখার জন্য ১৯৮৮ সালে শ্রমমন্ত্রীদের বৈঠকে VDA (Variable Dearness Allowance) অর্থাৎ পরিবর্তনশীল মহার্ঘ ভাতা যুক্ত করে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। যে সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই VDA মেনে নিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ তার অন্যতম।

এ অবধি তো ঠিক আছে। আইন-কানুন সবই আছে। কিন্তু চা-বাগান শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত দর কষাকষি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট ১৯৪৮ সালে এক্ষেত্রে বুঝি প্রযোজ্য নয়! হ্যাঁ, সেই দর কষাকষিতে সরকারপক্ষও উপস্থিত থাকে। কেবল ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণেই (যা শ্রমিকদের অধিকারও বটে) যা আপত্তি। চা-বাগানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি অবশ্য ব্রিটিশরাই শুরু করে গেছে। ১৮৬৫ থেকে শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি নির্ধারিত হয়। ১৯০১ সালের Act VI অনুযায়ী চা-বাগানের পুরুষ, মহিলা ও নাবালক শ্রমিক পেতেন যথাক্রমে ৫ টাকা, ৪ টাকা ও ৩ টাকা (তিন বছরের চুক্তি, প্রতি বছরে বৃদ্ধি ৫০ পয়সা)। এই ধরনের চুক্তি ভিত্তিক মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতিই এখনও চলছে।

মালিকপক্ষ একটি যুক্তি দেখান যে, চা-বাগানের শ্রমিকরা মজুরিটা কেবল টাকায় পান না। দি প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট ১৯৫১ (PLA) অনুযায়ী তাঁরা কোয়ার্টার পান, চিকিৎসা পরিষেবা পান, রেশনে ভর্তুকি পান, জ্বালানি কাঠ পান, পান আরও এটা-ওটা-সেটা। (কতটা কী পান সেটা আমরা এই রচনাতেই পরে দেখব)। ওই সব জুড়ে কিন্তু মজুরিটা যথেষ্ট বেশি। তাই নাকি? তাহলে দক্ষিণ ভারতের কেরালা বা তামিলনাড়ুর চা-শ্রমিকরা যথাক্রমে দৈনিক ২২৫ টাকা আর ২১০ টাকা পাচ্ছেন যে! এর সঙ্গে আবাসন, চিকিৎসা পরিষেবাও পাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে মজুরিটা মাত্রই ৯৫ টাকা কেন? ১০০ দিনের কাজেও তো ১৫১ টাকা রোজগার হয়? মনে রাখতে হবে, কেরালা বা তামিলনাড়ুর চা কিন্তু নিকৃষ্ট মানের। দার্জিলিং-এর চায়ের কথা ছেড়ে দিন, তরাই-ডুয়ার্সের চা-ও অনেক উৎকৃষ্ট। উত্তর ভারতের নিলাম কেন্দ্রগুলিতে এই বছরের জুলাই পর্যন্ত প্রতি কেজি চায়ের গড় দাম ১৪৩ টাকা ৮৯ পয়সা। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের নিলাম কেন্দ্রগুলিতে এই গড় ৮৭ টাকা ৮৯ পয়সা। অথচ দক্ষিণ ভারতের শ্রমিকরা তুলনায় অনেক বেশি টাকা পান। দক্ষিণ ভারতের বাগান-মালিকরা নিজেদের ক্ষতি করে তা নিশ্চয়ই দেন না!

আর চা-বাগান মালিকরা প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী চলেন কি? বাস্তব তো অন্য কথা বলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে। *ডাউন টু আর্থ* পত্রিকার ১ এপ্রিল ২০১৪ সংখ্যায় তার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সমাজকর্মীদের একাংশ যা বলতেন, সরকারি সমীক্ষক দল তাতেই সিলমোহর লাগিয়েছেন। কিছু তথ্য নেওয়া যাক :

১) আবাসন : *PLA-র ১৫নং ধারায় প্রতি শ্রমিক-কর্মচারীর জন্য যথাযথ আবাসন তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ বাধ্যতামূলক।*

১,৮৬,৫৫৯টি পরিবারের মোট ১১,২৪,৯০৭ জন শ্রমিক-কর্মচারী উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে থাকেন। ২,৬২,৪২৬ জন স্থায়ী শ্রমিকের মধ্যে ৮৫,৮৩৫ জনের কোনও ঘরের ব্যবস্থা নেই। PLA অনুযায়ী প্রতি বছর শ্রমিক-কর্মচারীর বাসভবন রক্ষণাবেক্ষণ খাতে খরচ করার কথা বাগান-মালিকের। ২০০৯ সালে ৫৩টি এবং ২০১২ সালে ৬২টি বাগান পাওয়া যাচ্ছে যারা এই খাতে একটি পয়সাও খরচ করেনি। এদের মধ্যে ৩৭টি বাগান ২০০৯-২০১২ সময়কালের মধ্যে একটি পয়সাও খরচ করেনি আবাসন খাতে।

২) পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শৌচাগার : ৪৪টি বাগানে কোন শৌচাগার নেই। ১২টি বাগানে বিদ্যুৎ একেবারে নেই। দার্জিলিং পাহাড়ের বাগানগুলিতে জলকষ্ট একটি অতি স্বাভাবিক বিষয়। *PLA-র ৮নং ধারা অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীর জন্য পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক।*

৩) চিকিৎসা পরিষেবা : *PLA-র ১০নং ধারায় বাগানে যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা বলা আছে। The West Bengal Plantation Labourer Rules 1956-এ বাগান-হাসপাতাল ও গ্রুপ হাসপাতালের কথা পরিষ্কারভাবে বলা আছে।*

তরাই-ডুয়ার্স-পাহাড় মিলিয়ে মোট ২৭৩টি বাগানের মধ্যে ১৬৬টি বাগানেই কেবল হাসপাতাল নামক বস্তুটি আছে। তার মধ্যে কেবল ৫৬টি বাগানেই সবসময়ের ডাক্তারবাবু আছেন। বাকি ১১০টি বাগানে বাইরে থেকে ডাক্তার আসেন (অবশ্যই প্রতিদিন নয়)। তাদের মধ্যে আবার মাত্র ৭৪ জন এমবিবিএস ডিগ্রিধারী। ১১৬টি বাগান আছে, যেখানে একজনও প্রশিক্ষিত নার্স নেই। দশটি বাগান পাওয়া গেছে, যেখানে হাসপাতাল দূরে থাক, ডিসপেনসারি অবধি নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, PLA অনুযায়ী বাগানে হাসপাতাল বাধ্যতামূলক এবং সেখানে অন্তত একজন এমবিবিএস ডাক্তার আর একজন প্রশিক্ষিত নার্স থাকা প্রয়োজন। ১৬০টি বাগানে অ্যাম্বুলেন্স আছে, ১১৩টিতে তাও নেই।

৪) প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও মজুরি : ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে প্রভিডেন্ট ফান্ডে এক টাকাও জমা করেনি ৪১টি বাগান। গত চার বছরে শ্রমিক-কর্মচারীদের এক পয়সাও গ্র্যাচুইটি দেয়নি ২২টি বাগান। ৫৫টি বাগানের মালিকপক্ষের প্রদেয় প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়া ৩৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। এছাড়াও শ্রমিকদের থেকে কেটে নেওয়া টাকাও জমা করেনি ৬৪টি বাগান। টাকার অঙ্কটা ১৭ কোটি ১৪ লক্ষের বেশি। এছাড়াও আটটি বাগানে শ্রমিক মজুরি বাকি আছে। ৩৫টি বাগানে বকেয়া দেওয়া বাকি।

৫) রেশন : ৩৫টি বাগানে রেশনের টাকা বাকি আছে।

এ সবের সঙ্গে যুক্ত করুন ইলেকট্রিক বিল জমা না দেওয়া, ভেজাল ওষুধ কেনা, নবজাতক সহ মহিলা শ্রমিকের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ক্রেশের ব্যবস্থা না-করা। যদিও ওই 'শ্রমিক কল্যাণ'-এর গল্পে সবটাই ঢুকে আছে। ওহো, বলতে ভুলে গেছি। ১৭৫টি বাগানে ওয়েলফেয়ার অফিসার নামক বস্তুটিই নেই।

তো এই হলো অবস্থা। বাগান-মালিকরা দেখাতে চান, তাঁরা মজুরিটা দেন টাকা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা মিলিয়ে। সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রকও বেশিরভাগ সময় তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলেন। ২০০২ সালে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের তৈরি করা কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছিল, তাতে দেখানো হয়েছে উত্তর ভারতের চা-বাগানগুলি (অর্থাৎ অসম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, হিমাচলের বাগান) বছরে ৪৬০ কোটি টাকা শ্রমিক কল্যাণে খরচ করে। ২০০৭-এর ও পি আর্য কমিটি দেখায়, উত্তর ভারতের প্রতি কেজি মেড-টি পিছু এই খাতে খরচ ৪ টাকা ১২ পয়সা। আমরা দেখলাম, এই কথাগুলি জলজ্যান্ত মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। এর ওপরে বাগান রুগ্ন দেখিয়ে সরকার থেকে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি বাবদ আদায় করা তো আছেই। এইসব মিলিয়ে আজকে চা-শিল্প যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, বলা যেতেই পারে, তা হলো ভারতের শ্রমিক শোষণের বৃহত্তর ভাগাড়। মাত্র একশো গ্রাম উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চা বিদেশের বাজারে ১০০০ টাকায় বিক্রি হয়। বাগানমালিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি সরকারি কমিটি-গুলির ওইসব হাবিজাবি তথ্য মেনে নিলেও যা দাঁড়ায়, তাতে ওই একশো গ্রামের জন্য লাভ কম করে ৩০০ টাকা! এর পাশে ওই একশো গ্রাম থেকে শ্রমিক পান কত? ছেড়ে দিন, অঙ্কটা একেবারেই হাস্যকর দেখাবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দাবি উঠছে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের এবং তা সরকারি গাইডলাইন মেনেই। দাবি উঠছে তার সঙ্গে VDA যুক্ত করার। আমাদের সত্যিই বিস্ময় জাগে যখন দেখি কোনও সরকারই চা-করদের বিরুদ্ধাচরণ করতে চায় না। বর্তমান রাজ্য সরকারও নিশ্চয়ই করবে না, কারণ সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ চা-বাগানের রেজিস্ট্রেশনই নেই। অনেক বাগানের লিজের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু নতুন লিজের জন্য আবেদন তারা করেনি। এ সবই অপরাধ। অথচ কী পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার, কী বর্তমান তৃণমূল সরকার, কোনও রাজ্য সরকারই এ বিষয়ে কিচ্ছুটি করতে অনিচ্ছুক। ভোটের খরচ যোগাড় করতেই কি এ বাধ্যবাধকতা? এই জন্যই ১১ লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবনকে অসহায় অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখা? এই জন্যেই কি শ্রমিক পক্ষের টাকা কেটেও প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা-না-করা জোচ্চোরদের গ্রেফতার করা যায় না?

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন ইউনিয়ন একযোগে উপযুক্ত ন্যূনতম মজুরির দাবি তুলছেন। বাকি বঙ্গের মানুষেরও বোধহয় কিছু দায় আছে সীমাহীন এই শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ানোর।

কৃতজ্ঞতা :

১. Indian Labour Journal : vol. 54, Feb, 2013
২. ILO Gobal Wage Report 2012/13
৩. Sayantan Bera : West Bengal labour department's tea garden survey kept under wraps, DOWN TO EARTH, April 2014.
৪. নর্থ বেঙ্গল টী প্ল্যান্টেশন ইউনিয়ন বুলেটিন, অগাস্ট ২০১১।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা : অভিজিৎ রায় এবং রবি ভট্টাচার্য

এর পর ৩২ পৃষ্ঠায়

এস্‌এস্‌সি প্রার্থীদের অনশন চলছে

সুতনয়া

চূড়ান্ত মেধাতালিকাভুক্ত হয়েও চাকরি না পেয়ে আন্দোলনে নেমেছেন কয়েক হাজার এস্‌এস্‌সি চাকুরিপ্রার্থী। ২০১১ সালের মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা হয়। টেট পরীক্ষা (পাস করেন ১ লক্ষ ৭৩ হাজার), দ্বিতীয় ধাপের বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা, পার্সোনালিটি টেস্টের পর চূড়ান্ত মেরিট লিস্টে নাম রয়েছে ৩৫,৫৯০ প্রার্থীর। সেকেন্ডারি শিক্ষকশিক্ষিকা নিয়োগের এই পরীক্ষার আগে সরকারিভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের পক্ষে ঘোষিত শূন্য পদের সংখ্যা ৫৫,৭৪৯টি। এই ৩৫,৫৯০ প্রার্থীর মধ্যে চাকরিতে নেওয়া হয়েছে ২৭,০১৯ জনকে। তবে এই নিয়োগ মেরিট লিস্টের র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী হয়নি। যাঁর আগে নাম আছে, তিনি চাকরি পাননি, পরে র‍্যাঙ্ক নিয়ে চাকরি পেয়েছেন, এমনটাও হয়েছে। আবার এমন ব্যক্তিও আছেন, যাঁর নাম মেরিট লিস্টে নেই, কিন্তু তিনি চাকরি পেয়েছেন। উঁচু র‍্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও চাকরি না পেয়ে আত্মহত্যা করেন রুমা দাস নামে মেরিট লিস্টভুক্ত প্রার্থী।

চাকরি না পেয়ে হাজার তিনেক প্রার্থী 'ছাত্র-ঐক্য সংগ্রাম মঞ্চ' তৈরি করে আন্দোলন শুরু করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে আচার্য সদনের সামনে রিলে অনশন শুরু করেন তাঁরা। ২১ দিন চলে অনশন। যে অনশনের মধ্যে সম্ভাব্য ক্যান্সারের রুগি নিত্যগোপাল মণ্ডল মারা যান। এস্‌এস্‌সি চেয়ারম্যান ও রাজ্যপালের লিখিত আশ্বাসে অনশন তুলে নেওয়া হয়। যে কোনো আন্দোলনকে মাওবাদী তকমা দেওয়ার ধারা অনুসরণ করে এস্‌এস্‌সি সহসচিব অমিতেশ দেব আন্দোলনকারীদের উগ্রবামপন্থী আখ্যা দেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে আন্দোলনকারীরা তাঁর অফিস জ্বালিয়ে দিতে পারে। আশ্বাসের পরও সরকারি তরফে কোনো সুরাহা না পেয়ে আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন স্থানে মিছিল-বিক্ষোভ করেন এবং অবশেষে ২৭ জুন থেকে কলেজ স্কোয়ারে অনশন শুরু করেন। আন্দোলনকারীরা গত ৪ আগস্ট কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী স্মৃতি ইরানীর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তাঁর তরফে এখনও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানা যায়নি। কিছু প্রার্থী বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন। সেখানে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয় যে ২৮,৫২২ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে সুপ্রিমকোর্টে বিএড্‌ পাশ চাকুরিপ্রার্থীদের অন্য একটি মামলায়, রাজ্য সরকার ৩৬,১৪০ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। তথ্যের এই গরমিল আরও বেশি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। ২০১১ সালে এস্‌এস্‌সি-র বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর ২০১২ সালে সংরক্ষণের তালিকাভুক্ত হয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিএড্‌ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশও অমান্য করা হয়েছে। মিডিয়ায় শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ করার কারণে এস্‌এস্‌সি-র ডেপুটি সেক্রেটারি অমিতেশ বিশ্বাস-কে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত বছরের পাঁচ হাজার সফল প্রার্থীকে নিয়োগ না করেই, এ বছর আবার এস্‌এস্‌সি নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে খুব একটা সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ক্ষমতাসীন দলের পছন্দের প্রার্থীদের নিয়ম বহির্ভূত পথে চাকরি পাইয়ে দিতে গিয়েই গোলমালটা দানা বেঁধেছে। প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকশিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের আত্মীয়স্বজনকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এক সূত্রের বক্তব্য, এস্‌এস্‌সি-র দপ্তরে নাকি তৃণমূল নেতানেত্রীদের তরফে প্রায় পনের হাজার সুপারিশ পত্র জমা পড়েছে। কাগজে-কলমে শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও সরকার চাকরি দিতে কেন অপারগ, তার সম্ভাব্য কারণ বোধহয় এটাই। নির্বাচনে জেতার পর, সুবিধাবাদী নীতিহীন নেতৃত্বাধীন একটি দলের অন্তত কিছু নেতা-কর্মীদের তো খুশি করতে হবে, না হলে দল থাকবে কী করে? বিগত সরকারও বিশাল ব্যতিক্রমী ছিলনা এদিক দিয়ে। কলেজে ইউনিয়নের আশীর্বাদে ছাত্রভরতি তখনও হতো। সরকারের কাছের লোক বরাত সেকালেও পেত। ক্ষমতাসীনদের তাঁবেদারি করার সংস্কৃতি বহুদিনের। তাতে ফাঁকে পড়ে থাকে অগুন্তি সাধারণ মানুষ, মৃত নিত্যগোপালের মতো, যিনি সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভের হাড়ভাঙ্গা খাটনি করে একচল্লিশ বছর বয়সে এস্‌এস্‌সি দিয়েছিলেন চাকরির আশায়। রুমা দাসের মতো, যাঁর পরিবার একা তাঁকেই পড়াতে পেরেছিল এই আশায় যে তিনি একটা সরকারি চাকরি করে শয্যাশায়ী ছুতোর-মিস্ত্রি বাবা এবং ছোটখাটো কাজকর্ম করে সংসার চালানো ছোট দু'ভাইয়ের দারিদ্র একটু কমাবেন। বেকারত্ব ও চাকরির নিরাপত্তা কতদূর, তা বোঝা যায় যখন এস্‌এস্‌সি, প্রাইমারি টেট-এর মতো সরকারি চাকরি পরীক্ষাগুলিতে ৬ লাখ, ৪৫ লাখের মতো পরীক্ষার্থী প্রতিযোগিতা করে।

চাকরি পাওয়ার ন্যায্য দাবিতে আন্দোলনকারীরা আন্দোলন চালাবার জন্য চাঁদা তুলেছেন, প্রতীকী ভিক্ষা করেছেন, ব্লাড ব্যাঙ্কে নিজেদের রক্ত বেচেছেন। তাঁদের দাবি, 'একটি মাত্র কাউন্সেলিঙের মাধ্যমে নির্বাচিত চূড়ান্ত মেধাতালিকাভুক্ত প্রার্থীদের অবশিষ্ট সকল প্রার্থীদের যত শীঘ্র সম্ভব নিয়োগ করতে হবে।'

অক্ষরধাম মামলার রায়— একটি অনুসন্ধান

সুমন কল্যাণ মৌলিক

যুদ্ধ চলছে, অন্তহীন যুদ্ধ। মহামহিম রাষ্ট্র আমাদের প্রতিনিয়ত জানান দিচ্ছে যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি আছে। আমাদের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্যই যুদ্ধের এই মহতী আয়োজন। বাসে, ট্রেনে, গৃহকোণে, প্রেমে-অপ্রেমে সতর্ক চোখ প্রতি মুহূর্তে নজর রাখছে নাগরিকের জীবনে। নাগরিক জিজ্ঞাসাহীনভাবে বেঁচে থাকবে কারণ তাকে বাঁচানোর জন্যই তো এত বাহিনী, সামরিক-অসামরিক বিভাগ, উন্নততর প্রযুক্তি। এত সক্রিয়তা আছে বলেই তো প্রায় প্রত্যেকদিন দেশের কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে বসে থাকা ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, হরকত-উল-আনসার বা সিমি-র মতো ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী দলগুলির ততোধিক ভয়ঙ্কর সদস্যরা গ্রেপ্তার হয়, ফাঁস হয়ে যায় বিস্ফোরণের নথি-নকশা, উদ্ধার হয় ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র। আমরা টিভিতে দেখি, খবরের কাগজে পড়ি। তারপর যারপরনাই আহ্লাদিত হই একথা ভেবে যে যাক, আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত। আইনরক্ষকরা গ্রেপ্তার হওয়া সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে নানান কঠিন ধারায় মামলা দায়ের করেন, গ্রেপ্তার হওয়া মানুষেরা জেলে পচতে থাকেন, আমরা অপেক্ষায় থাকি কবে এই সভ্যতার শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি ঘোষণা করা হবে। এরকম মসৃণ চিত্রনাট্য ভরসা যোগায় পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রকে। আইনরক্ষকদের সংগৃহীত প্রমাণগুলি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের কোন সুযোগ নেই, কারণ সরকার কোনো 'মিথ্যা' কথা বলেনা। 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' হিসাবে দু-একজন উলুখাগড়ার প্রাণ যেতে পারে, তবে সে বিষয়টা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

তবে সবাই যে এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করে থাকেন, ব্যাপারটা এমন নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই সারা দেশের অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা বা সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার হওয়া মানুষদের পরিবারগুলি অভিযোগ তুলছিলেন যে বহু মানুষকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে সন্ত্রাসবাদী সাজানো হচ্ছে। ইউপিএ, আফস্পা বা রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের মতো অগণতান্ত্রিক আইনগুলিকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নিরপরাধ মানুষদের জেলে আটক করে রাখা হয়েছে। কিন্তু একথা সাধারণ মানুষ খুব একটা বিশ্বাস করেননি। কেউ কেউ ভেবেছেন যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, অপরাধমূলক চক্রান্ত, বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো, উগ্রপন্থীদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহের মতো গুরুতর অভিযোগ কারোর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া পুলিশ আনতে পারে কি? অনেকে অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের অভিযোগকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি, কারণ মিথ্যা সাক্ষ্য বা প্রমাণ কেউ মামলার সময় উপস্থিত করলে এবং তা মিথ্যা প্রমাণিত হলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯৫নং ধারা মোতাবেক মিথ্যা সাক্ষীর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। একটি ভুয়ো সংঘর্ষ মামলায় মহামান্য আদালতের বক্তব্য ছিল, "একজন নিরপরাধ নাগরিককে পুলিশ অফিসার মিথ্যা অপরাধমূলক কেসে অভিযুক্ত করছে এর চেয়ে ভয়ংকর অপরাধ আর কিছু হতে পারেনা। যেসব পুলিশ অফিসারের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব আছে, তাদের বিরুদ্ধ হাল্কা ব্যবস্থা নয়, কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।"

কিন্তু বাস্তব ঘটনাপঞ্জী অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগকেই সত্য বলে প্রমাণ করছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র, যে ন্যায়-বিচার, মানবাধিকার ও সাম্যের কথা প্রায়শই বলে থাকে, সেই বক্তব্যের প্রতি গুরুতর প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। ১৯৯২-২০১২ সালের মধ্যে এই ধরনের বহু মামলায় অভিযুক্তদের মহামান্য আদালত শুধু খালাসই ঘোষণা করেননি, একের পর এক মামলায় পুলিশ কর্তৃক পেশ করা নথি, প্রমাণ ও দলিলকে সাজানো ও চক্রান্তমূলক বলে রায় দিয়েছে। এই ধারারই সাম্প্রতিকতম উদাহরণ অক্ষরধাম মন্দির হামলা মামলায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়। ২০১৪ সালের ১৬ মে প্রকাশিত এই রায় সম্পর্কে যদিও খুব একটা আলাপ-আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক চোখে পড়ছে না। তবুও এই রায় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আলাপ-আলোচনা না হওয়ার কারণ এই যে, কর্পোরেট মিডিয়া যে উৎসাহ ও সক্রিয়তার সঙ্গে পুলিশ কর্তৃক অভিযুক্ত সন্ত্রাসবাদীদের পুলিশ-কথিত কাহিনী শোনায়, তাদের বিচার প্রক্রিয়ার ফলাফল প্রচারে তাদের সে উৎসাহ থাকে না। এই ধরনের রায় প্রকাশিত হলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অন্তহীন যুদ্ধের খবর বিক্রিতে ভাটা পড়তে বাধ্য।

সুপ্রিম কোর্টের রায় ও অক্ষরধামের ঘটনাকে ফিরে দেখা

সুপ্রিম কোর্ট তার ৬ই মে (২০১৪)-র রায়ে অক্ষরধাম মন্দিরে হামলায় অভিযুক্ত ছয়জনের মধ্যে চারজনকে ১১ বছর জেল খাটার পরে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছে। এদের মধ্যে তিনজন, আদমভাই আজমেরি, আবদুল কায়ুম মহম্মদ ভাই এবং চাঁদখান, ২০০৬ সালের জুলাই মাস থেকে ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ছিল। চতুর্থ জন অর্থাৎ মহম্মদ সেলিম হানিফ সেখ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। পঞ্চম অভিযুক্ত আবদুল মিঞা নিম্ন আদালতে দশ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ৭ বছর জেল খাটার পর বর্তমানে জামিনে

মুক্ত ছিলেন। ষষ্ঠ আলতাফ মালিক ৫ বছরের সাজার মেয়াদ শেষ করার পর মুক্তি পান। শুধু এই ছয়জনকে বেকসুর মুক্তিই নয়, এই মামলার রায় দিতে গিয়ে সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে— ''এই ধরনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলায়, যার সঙ্গে দেশের সংহতি ও নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িত, পুলিশ যেভাবে তদন্ত করেছে তা তাদের অযোগ্যতাকেই প্রকাশ করে। এতগুলো মানুষের জীবনহানির জন্য দায়ী প্রকৃত অপরাধীদের না গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিরপরাধ মানুষদের ধরে তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে মামলা সাজিয়েছে, যার ফল এই নিরপরাধ মানুষদের শাস্তিপ্রাপ্তি।'' (এই মামলার রায় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য Adambhai Sulemanbhai Ajmeri & Ors Appeallants Vs State of Gujrat...Respondent With Criminal appeal no 45 of 2011, www.supremecourtofindia.nic.in/outtoday/cal Appeal No 2295-2296 of 2010.pdf দ্রষ্টব্য)।

অক্ষরধাম মন্দির হামলার ঘটনা ঘটেছিল ২০০২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। সেদিন গুজরাটের গান্ধীনগরে অবস্থিত অক্ষরধাম মন্দিরে দুজন আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত 'ফিদাঁয়ে' নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে ৩৩ জন মারা যান এবং ৮৫ জনের বেশি আহত হন, যার মধ্যে অনেকেরই আঘাত ছিল অত্যন্ত গুরুতর। নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে গুলিযুদ্ধ চলবার পর ২৫শে সেপ্টেম্বর ভোরবেলায় ফিদাঁয়ে জঙ্গিরা মারা যায়। ঐ দিনই এফআইআর দায়ের করে পুলিশ ইন্সপেক্টর ভি আর তোলিয়া-র হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়। ৩রা অক্টোবর অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড (ATS) তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তারপরের দশ মাস মামলার কোন অগ্রগতি হয়নি। তারপরের ঘটনা ছিল যথেষ্ট 'নাটকীয়'। ২০০৩ সালের ২৮শে আগস্ট ক্রাইম ব্রাঞ্চের এসিপি সিংহল-এর হাতে মামলাটি তুলে দেওয়া হয়। (এই সিংহল ইশারাত জাহান হত্যাকাণ্ডে সিবিআই কর্তৃক অভিযুক্ত ও নির্দিষ্ট সময়ে চার্জশিট দিতে না পারার কারণে দীর্ঘদিন সাসপেন্ড থাকার পর ২০১৩ সালের মে মাসে চাকরিতে পুনর্বহাল হয়েছেন।) ঐদিনই সিংহল তার উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার ডি জি বানজারার মৌখিক নির্দেশক্রমে আসফাক জাহাঙ্গির নামে জনৈক মুসলিম যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। ডি জি বানজারা নামটা অবশ্য অপরিচিত নয়। নরেন্দ্র মোদির একদা অত্যন্ত আস্থাভাজন এই পুলিশ অফিসার লোকসভা নির্বাচনের সময়ে এক বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে অভিযোগ করেছিলেন যে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশে একের পর এক এনকাউন্টার চালানোর পর সিবিআই তদন্ত শুরু হলে গুজরাট প্রশাসন তাদের মতো 'কর্তব্যনিষ্ঠ ও বশম্বদ' পুলিশ অফিসারকে বাঁচাতে এগিয়ে আসছে না। দায়িত্ব নেবার পরের দিনই সিংহল পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ২০০২ সালে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গার প্রতিশোধ হিসাবে অক্ষরধাম মন্দিরে হামলার পরিকল্পনা করা হয় এবং হামলার নকশা রচিত হয় সৌদি আরব, হায়দ্রাবাদ, আমেদাবাদ ও জম্মু-কাশ্মীরে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে *পোটা* প্রয়োগ করা হয়। কাকতালীয়ভাবে ঠিক পরেরদিন জম্মু-কাশ্মীরের আইজি এক ফ্যাক্সবার্তায় গুজরাট এটিএসকে জানান যে, তাদের হেফাজতে থাকা এক ব্যক্তি জেরার সময় অক্ষরধাম মন্দিরে হামলায় তার যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছে। অর্থাৎ সিংহল দায়িত্ব নেবার তিনদিনের মধ্যেই অক্ষরধাম হামলার চক্রীরা ধরা পড়ে গেল! একমাসের মধ্যে ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন পুলিশ হেফাজতে রীতিমতো জবানবন্দি দিয়ে তাদের অপরাধের কথা কবুল করল। গুজরাট সরকার অভিযুক্তদের *পোটা* আইনে বিচার করার অনুমতি দেবার পর ২০০৩ সালের ২৫ নভেম্বর *পোটা* বিশেষ আদালতে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে এবং ২০০৬ সালের ১ জুলাই বিশেষ আদালতে পুলিশ অভিযুক্তদের সাজা ঘোষণা করে (নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখিত)। গুজরাট হাইকোর্টে অভিযুক্তরা আবেদন করলে, সেখানেও একই সাজা বহাল রাখা হয়। সাজাপ্রাপ্তরা সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করলে তারা বেকসুর খালাস পেল।

অক্ষরধাম মামলা— সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ

অক্ষরধাম মন্দির হামলার ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া, বিচার ও রায়দান সম্পর্কে সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ নানান দিক থেকে চিন্তা উদ্রেককারী। এই পর্যবেক্ষণ অনুধাবন করার সুবিধার জন্য বিষয়গুলি পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করা হল—

❑ সর্বোচ্চ আদালতের প্রথম বিচার্য বিষয় ছিল, গুজরাট সরকার *পোটা* আইনের ধারা ৫৩ অনুসারে অভিযুক্তদের বিচার চালানোর ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল কিনা। এই অনুমতি দানের বিষয়টি রাখা হয়েছে যাতে এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা যায়। আদালতের মতে গুজরাট সরকারের স্বরাষ্ট্রদপ্তর এক্ষেত্রে যথাযথ আইন বা বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করেনি (পৃ. ১০৯, অনুচ্ছেদ ৭৭)। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যেতে পারে যে তৎকালীন গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র মোদী এবং ঐ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন অমিত শাহ।

❑ এই মামলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল অভিযুক্তদের *স্বেচ্ছাকৃত* জবানবন্দি। ভারতীয় সংবিধানের ২০(৩) ধারা অনুসারে পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন অভিযুক্তদের দেওয়া জবানবন্দি আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হবে না। কিন্তু *পোটা* আইনের ৩২নং ধারা অনুসারে পুলিশের কাছে দেওয়া জবানবন্দি গৃহীত হবে যদি

সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ বা তার উর্ধ্বতন মর্যাদার পুলিশ অফিসারের কাছে সেই সাক্ষ্য দেওয়া হয়। বর্তমান মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণকারী অফিসার ডিসিপি সঞ্জয়কুমার গাদভি আদালতে জানিয়েছেন যে, সাক্ষ্যগ্রহণের সময় তিনি অভিযুক্তদের এটা জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি যে এই জবানবন্দি তাদের বিপদে ফেলবে না, এমনকি এই সাক্ষ্য দেবার জন্য তদন্তকারী অফিসাররা অভিযুক্তদের শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করেছিল কিনা সে ব্যাপারেও চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। অথচ সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলার সময় সমস্ত অভিযুক্তরা জানিয়েছেন কীভাবে পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন তদন্তকারী অফিসাররা (এসিপি সিংহল, ভি ডি বানার, আর আই প্যাটেল প্রমুখ) তাদের উপর থার্ড ডিগ্রি অত্যাচার চালাতেন, এনকাউন্টারে মেরে ফেলা ও পরিবারের বাকি সদস্যদের জীবনহানি করার হুমকি দিতেন। এমনকি ২০০৩ সালের ৫ই নভেম্বর *পোটা* বিশেষ আদালতে অভিযুক্তরা অত্যাচারের মাধ্যমে জবানবন্দিতে সই করানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন (পৃ. ৪৫, ৪৬, অনুচ্ছেদ ৩২)। স্বাভাবিকভাবেই সর্বোচ্চ আদালত এই জবানবন্দি ও স্বীকারোক্তিগুলোকে "Highly contradictory and inprobable in nature" বলে উল্লেখ করেছেন (পৃ. ২৫৫, অনুচ্ছেদ ১২৫)।

❑ এই মামলায় পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে উর্দু ভাষায় লেখা দুটি চিঠি দাখিল করেছিল, যাতে অক্ষরধাম মন্দির হামলার চক্রান্তের কথা লেখা ছিল। এই চিঠির বাস্তবতা ছোটদের রূপকথার গল্পকে হার মানায়। এই চিঠির অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে মহামান্য আদালত বলেছেন— ''নিহত ফিদায়েঁ জঙ্গিদের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে তাদের জামাকাপড় ছিল রক্তাক্ত ও কাদামাখা। উপর্যুপরি গুলির আঘাতে সমস্ত পোশাক ছিন্নভিন্ন। অথচ যে চিঠি দুটি আদালতে পেশ করা হয়েছে তা পরিষ্কার, নিভাঁজ ও ঝকঝকে। এক ফোঁটা কাদা বা রক্তের দাগ নেই। তাই প্রমাণ হিসাবে এই চিঠি দুটি অস্বাভাবিক ও অগ্রহণীয়'' (পৃষ্ঠা ২০৪, অনুচ্ছেদ ১০৩)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অভিযুক্তদের আইনজীবী হাইকোর্টে চিঠির অসারতার বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতি ''Truth is stranger than fiction'' নামক বহুল প্রচলিত আপ্তবাক্য আউড়ে পুলিসের বয়ানকেই বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্টের এই বক্তব্যকে সরাসরি নাকচ করেছে (পৃ. ২০৪, অনুচ্ছেদ ১০৩)।

❑ সর্বোচ্চ আদালত এই মামলার ক্ষেত্রে গুজরাট পুলিশের তৎকালীন ডিজি বানজারার ভূমিকার বিষয়টিও উদ্‌ঘাটন করতে ছাড়ে নি। আদালতের আশঙ্কা, নিরপরাধ এই মানুষদের মামলায় জড়ানোর ক্ষেত্রে বানজারার ভূমিকা ছিল। তদন্তকারী অফিসার সিংহলের নথিভুক্ত বয়ান অনুসারে আসফাক জাহাঙ্গিরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু গোটা তদন্ত প্রক্রিয়ায় একবারের জন্যও বানজারাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এমনকি ঘটনা ঘটার প্রায় একবছর পর বানজারা কীভাবে জাহাঙ্গিরের খোঁজ পেলেন সে ব্যাপারেও তদন্তে কোন আলোকপাত করা হয়নি (পৃ. ১৮২-৮৩, অনুচ্ছেদ ৯৬)।

❑ নিম্ন আদালতগুলির ভূমিকাও সর্বোচ্চ আদালতে সমালোচিত হয়েছে। অভিযুক্তদের ডাক্তারি পরীক্ষা যে চিকিৎসকরা করেছিলেন তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন যে স্বীকারোক্তি দেওয়ার আগে পুলিশ অফিসাররা অভিযুক্তদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করেছে— এমন অভিযোগ তারা পেয়েছে। অথচ তদন্ত চলাকালীন পুলিশ জানায় অভিযুক্তদের মেডিক্যাল ও এক্সরে রিপোর্ট তাদের হেফাজত থেকে হারিয়ে গেছে। এই গাফিলতি নিয়ে বিশেষ আদালত ও হাইকোর্ট কোন ব্যবস্থা নেয়নি দেখে সর্বোচ্চ আদালত তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে (পৃ. ৬৫, অনুচ্ছেদ ৪৮)।

এই পর্যবেক্ষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, একটা বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর মানুষদের অপরাধী প্রমাণ করতে গুজরাট প্রশাসন নিরপরাধ মানুষদের চক্রান্ত করে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে। তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতার নামে দানবীয় *পোটা* আইনকে ব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থপূরণের লক্ষ্যে। ন্যায়বিচারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নিম্ন আদালতগুলি প্রত্যাশা পূরণে নিদারুণ ব্যর্থ। *পোটা* আজ নেই, কিন্তু তার বদলে এসেছে আরো ভয়ঙ্কর *ইউএপিএ* আইন।

এই নির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে মহামান্য আদালতের ভূমিকা অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, যে অপরাধ তারা করেননি, সেই অপরাধের জন্য ১১ বছর জেলে কাটানো নিরপরাধ মানুষগুলির জন্য সর্বোচ্চ আদালত কোন আর্থিক বা অন্য ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেনি। যে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিরা এই নিরপরাধ মানুষগুলিকে বেআইনিভাবে পুলিশ হেফাজতে আটকে রেখেছিল, প্রমাণ গোপন করেছিল, মিথ্যা প্রমাণ হাজির করেছিল, নির্দয় অত্যাচার চালিয়েছিল— তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও যথোপযুক্ত শাস্তির নির্দেশও এই রায়ে নেই। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই রায় শিক্ষা দেয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে আজ প্রয়োজন নিরন্তর সক্রিয়তা ও নাগরিক উদ্যোগ। এই রায় অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে আরো সক্রিয় হবার আহ্বান জানায়।

প্রবন্ধ

রহস্যোপন্যাস নয়

গৌতম চৌধুরী

এক

"আমি জানি এই স্বীকারোক্তির জন্য আমার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। তবু আমি তা দিতে চাই...।" ২০১০ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিচারকের সামনে এক সন্ত্রাসবাদীর এই স্বীকারোক্তি এক অবিশ্বাস্য রহস্যকাহিনী মেলে ধরেছে। এটা কোনো গল্প নয়, সবই সিবিআই-এর কেস ডায়েরি থেকে নেওয়া, তবু গল্পের চেয়েও অবিশ্বাস্য মনে হয়। একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর এবং মানবিক এক উপাখ্যান।

গত এক দশকে সন্ত্রাসবাদী হামলার ভারত আর পাকিস্তান দুই দেশেরই সাধারণ মানুষ মরেছে পথেঘাটে, বাজারে, ধর্মস্থানে, ট্রেনের কামরায়। কত যে আহত হয়েছে, পঙ্গু হয়ে গেছে কতজন, তার সঠিক হিসেব জানা নেই। আর নিজেদের দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলার দায় প্রতিবেশীর ওপর চাপানো, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষদের সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে অন্যায়ভাবে যুক্ত করা— এসবের ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা আরো বেড়ে চলা আর বাড়িয়ে চলা অব্যাহত থেকেছে দেশপ্রেমের নামে। এই পটভূমিতেই এই কাহিনী।

২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর (২৬/১১) মুম্বাইয়ে এক ভয়ঙ্কর হামলা চালায় একদল পাক-সন্ত্রাসবাদী। পাক জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবা আর মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ— এই দুইয়ের ডবল এজেন্ট ডেভিড হেডলির সহায়তায় আর লস্করের পরিচালনায়। পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকার যখন ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের চেষ্টা করছে আন্তরিকভাবে, সেই সময় পাক সেনাবাহিনীর মদতে ঘটল ঐ আক্রমণ। সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় নিযুক্ত মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার তথা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী স্কোয়াড (Anti-terrorist Squad, ATS)-এর প্রধান হেমন্ত কারকারে, অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার ও এটিএস-এর অন্যতম নেতৃস্থানীয় অফিসার অশোক কামতে ও ইন্সপেক্টর বিজয় সালাসকর সেদিন নিহত হন। সিবিআই তদন্তে জানা যায়, কামতে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত হন, কিন্তু বাকি দুজন? স্পষ্ট নয়। অনেক প্রশ্ন উঠে আসে।

একই গাড়িতে তিনজন অফিসার কেন, যা প্রোটোকল বিরোধী? মুম্বাইয়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তারা এসে জড়ো হলেন একই গাড়িতে, কেন? কেউ কি তেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন? কে তিনি? রাত্রি ৯টা ৪৫-এ কে কারকারেকে ফোন করে? ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাসে গিয়ে দেখেন তেমন কিছু নেই তখন কামা হাসপাতালে যেতে কে তাকে ফোনে নির্দেশ দেয়? কোনো অদৃশ্য হাতই যে তাদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ডেকে এনে মৃত্যুর দিকে চালিত করেছিল কামা হাসপাতালে পাঠিয়ে, এই অভিযোগ যথাযথভাবে খণ্ডন করা যায়নি। স্টেশন থেকে নিম্নমানের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট আর হেলমেট পরে তিনি গেলেন কেন? সেই জ্যাকেট কোথায় গেল? (অনেক পরে সেটা পাওয়া গেছে) এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। আদালতে তার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পুলিশ প্রথমদিকে দিতে চায়নি। কেন? যে পাঁচটি গুলি কারকারের শরীরে লেগেছিল তার দুটি দেহের মধ্যে পাওয়া গেছে কিন্তু সেগুলো গেল কোথায়? বাকিগুলোরও খবর নেই। কার বন্দুক থেকে সেগুলো এসেছিল তারও উত্তর পাওয়া যায়নি। চক্রীদের হাত যে খুব লম্বা তা বোঝা যাচ্ছিল। ফলে রহস্যের যবনিকা সরছিল না। অনেকটা সরেছে ঐ সন্ত্রাসবাদীর স্বীকারোক্তিতে।

দুই

এর কিছুদিন আগের কথা। সন্ত্রাসবাদী হামলার তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা পড়লেন মুস্কিলে। কেঁচো খুড়তে গিয়ে কেউটে-গোখরোর দেখা মিলতে লাগল। পেছনে বড় কোনো ষড়যন্ত্র আছে এটা তারা ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন। আর মহারাষ্ট্রের এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে সেই প্যান্ডোরার বাক্স একেবারে খুলে দেন। দেশে যে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসের জাল বিস্তৃত হয়েছে যা ভারতীয় সামরিক বিভাগেও ঢুকে পড়েছিল, কারকারে তাকে উন্মোচিত করেন। মালেগাঁও বিস্ফোরণে গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যে চার্জশিট তিনি পেশ করেন তাতে সংবিধানের শাসন আর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ধ্বংস করার জন্য আন্তর্জাতিক মদতপুষ্ট মারাত্মক এক দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। (countercurrents.org, ২৬ অক্টোবর ২০০৯)

২০০৮-এ মালেগাঁও বিস্ফোরণের পর কারকারে তদন্ত শুরু করেন কিন্তু ২০০২ সাল থেকে এদেশে ঘটে চলা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের স্বরূপ খুলে দেয় সেই তদন্ত। ২০০৮-এর মালেগাঁও বিস্ফোরণে জড়িত সন্দেহে তিনি যে এগারোজনকে গ্রেপ্তার করেন তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন কট্টর হিন্দু-সাম্প্রদয়িক সংগঠনের লোক। ছিলেন লেঃ কর্নেল শ্রীকান্ত পুরোহিত, যিনি নাসিকের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছিলেন দয়ানন্দ পান্ডে, এক স্বঘোষিত ধর্মীয় গুরু যিনি জম্মুতে সারদাপীঠ নামে এক আশ্রম চালাতেন। আরো ছিলেন সাধ্বী প্রজ্ঞা, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থ পরিষদের নেত্রী যিনি সাধিকাতে পরিণত হয়েছেন। মুসলমানদের তোয়াজ করতেই যে এই গ্রেপ্তার এবং কারকারে 'জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক'— একথা সজোরে প্রচার করে বিজেপি-শিবসেনা। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও কারকারেকে

‘দেশদ্রোহী’ আখ্যা দেন। এসব ২৬/১১-র আগের কথা। শিবসেনা তো কারকারের এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১লা ডিসেম্বর মহারাষ্ট্র বন্‌ধও ডেকে বসেছিল। আর ২৬/১১-র পর বেকায়দায় পড়ে গোটা সঙ্ঘ পরিবার আর তার জ্ঞাতিরা কারকারেকে মহান দেশপ্রেমিক বলতে শুরু করল।

তিন

সংসদে কারকারের মৃত্যু নিয়ে নানা অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলেন সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী এ আর আন্তুলে। সে কাজ দেশবিরোধী, পাকিস্তানের সুবিধা করে দেবার জন্য তোলা হচ্ছে এসব বলে তাঁকে থামিয়ে দেওয়া শুধু নয়, বিজেপি-শিবসেনা সদস্যরা অবিলম্বে আন্তুলের পদত্যাগ দাবি করেন। পরে কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংহ জানান, সেদিনও মারা যাবার আগে সন্ধ্যা সাতটায় তাঁর সঙ্গে কারকারের ফোনে কথা হয়। কারকারের সঙ্গে ফোনে তাঁর মাঝে মধ্যে কথা হত। দুজনেই তারা মধ্যপ্রদেশের লোক, পূর্ব পরিচয় ছিল। কারকারে সেদিন আবার তাঁকে জানান বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর আরএসএস-এর পক্ষ থেকে তাকে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বারবার। তার সততা-নিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন রাজনাথ-আদবানি-গদকারি-রবিশঙ্কর প্রমুখ বিজেপি-র শীর্ষ নেতারা। তাদের মুখপত্রে গালাগালি দেওয়া আর নানা কুৎসা প্রচার করা হচ্ছে— দুবাই থেকে নাকি ১৭ কোটি টাকার এক কন্ট্রাক্ট পেয়েছে তার স্কুলে পড়া ছেলে। অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে অফিসার বাবাকেও ওরা হুমকি দিচ্ছে। কারকারে জানান এসবের ফলে তিনি খুব হতাশ। দিগ্বিজয় এসব বললে আবার বিপুল হইচই শুরু হয়ে যায়, তাঁকেও পাকিস্তানের দালাল বলা হয়। কংগ্রেস দল ওটা দিগ্বিজয়ের ব্যক্তিগত মতামত বলে এর দায়িত্ব নেয় না আর মুম্বাই পুলিশ জানায় সেদিন দিগ্বিজয়ের সঙ্গে কারকারর ফোনে কথাবার্তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দিগ্বিজয় সেই প্রমাণ পরে হাজির করেন এবং দাবি করেন সেই রেকর্ড প্রকাশ করা হোক। তা করা হয়নি। এসব ‘সংবেদনশীল’ বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা কারুরই পছন্দ হয়নি।

তবে শুধু দিগ্বিজয় একা নন, কিছু সাংবাদিক, পুলিশ অফিসার এবং কারকারের ঘনিষ্ঠ আরো অনেকে জানিয়েছেন সত্যিই ঐ সময়ে কারকারের ওপর হুমকি ছিল এবং মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তের খবর প্রচারিত হবার পর থেকে তাঁর পরিবারের সম্পর্কে যে মিথ্যা অভিযোগগুলো তোলা হচ্ছিল তাতে তিনি খুব বিচলিত (disturbed) ছিলেন। কিন্তু ভয় পাবার লোক তিনি ছিলেন না। যে কোনো পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তবে মৃত্যুর ঠিক এক সপ্তাহ আগে বাড়ির চারিদিকে দেওয়াল তুলেছিলেন আর বাড়িতে একটা কুকুরও এনে রেখেছিলেন। বিজেপি-শিবসেনা-বিশ্বহিন্দুপরিষদ-বজরঙ্গদল-আরএসএস ইত্যাদি অর্থাৎ সঙ্ঘ পরিবার ক্ষিপ্তভাবে ‘মহম্মদ কারকারে’ সম্পর্কে তাদের আক্রমণ তীব্র করল। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে, সোস্যাল নেটওয়ার্ক-এ, তাদের যে অসংখ্য ওয়েবসাইট আছে সেগুলোর মাধ্যমে আর ব্যক্তিগত স্তরে। বিভিন্ন নামকরা সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে, সাক্ষাৎকার-গ্রহীতার বিরুদ্ধে উন্মত্ত আক্রমণ শুরু হল। কারকারের মৃত্যুর পর ‘হিন্দুহৃদয়সম্রাট’ নরেন্দ্র মোদী, মাত্র কয়েকদিন আগে যিনি হেমন্ত কারকারেকে ‘দেশদ্রোহী’ আখ্যা দেন, তিনি যখন ‘শহিদ’ কারকারের বাড়িতে যান শ্রদ্ধা জানাতে, তখন হেমন্তর স্ত্রী কবিতা তার সঙ্গে দেখা করেননি, তার আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাবও ফিরিয়ে দেন। তবে, সত্যের সঙ্গে তখন ‘জাতীয় সেন্টিমেন্টের’ সংঘাত চলছিল। তাই কারকারের স্ত্রীও ‘পাকিস্তানের সুবিধা হবে’ এই একই যুক্তিতে দিগ্বিজয়ের বিরোধিতা করেন। (এই সেই ‘জাতীয় সেন্টিমেন্ট’ যার দোহাই দিয়ে বিচারক আফজল গুরুকে ফাঁসির আদেশ দেন, সংসদ আক্রমণে তার ভূমিকা প্রমাণিত না হলেও।) একরোখা অনুসন্ধানী কবিতা কারকারে পরে শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করে জানান, হেমন্ত আহত অবস্থায় প্রায় চল্লিশ মিনিট পড়ে ছিল, কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।

সংবাদে প্রকাশ, হেমন্ত কারকারে ও তার সঙ্গীরা সাহায্যের জন্য মরিয়া হয়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বার্তা পাঠাচ্ছিলেন, কিন্তু কোনো লাভ হল না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে, এদের মৃত্যুর এবং দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যাবার পর সাহায্য এলো। (‘হেডলাইনস টুডে’-র হাতে পুরো কল লগ রেকর্ড রয়েছে বলে তারা জানিয়েছে)

ওদিকে, এস এম মুসরিফ নামে মহারাষ্ট্র পুলিশের এক প্রাক্তন আইজি এক বই লিখেছেন— *হু কিল্‌ড কারকারে? দি রিয়াল ফেস অব টেররিজ্‌ম ইন ইন্ডিয়া*, যেখানে তিনি অনেক সহজলভ্য তথ্য দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন ভারতে ‘ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ’-এর পেছনে প্রকৃত খেলোয়াড় কারা, এবং বলেছেন যে কারকারে এদের মুখোশ খুলে দেবার স্পর্ধা দেখানোরই মাসুল দিয়েছেন এদের হাতে প্রাণ দিয়ে।

বোম্বে হাইকোর্টে বিহারের প্রাক্তন বিধায়ক রাধাকান্ত যাদব অভিযোগ জানিয়েছেন, হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্রের শিকার কারকারে। তার দাবি, পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে কারকারের মৃত্যু হয়নি। ‘অভিনব ভারত’ নামে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনটি কারকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছিল। শ্রী যাদব আরো অভিযোগ জানিয়েছেন যে, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আই বি) আগেই ঐ ২৬/১১-র হামলার পরিকল্পনার খবর পেয়েছিল। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-ও আগেই কয়েকবার জানিয়েছিল (*নিউইয়র্ক টাইমস*, ১৬ নভেম্বর ২০১০), যে কথা এদেশের RAW-ও স্বীকার করেছে।

তাঁর অভিযোগ, আইবি-র সঙ্গে যোগসাজশে ‘অভিনব ভারত’ কামা হাসপাতালে কারকারেকে হত্যার জন্য এক সমান্তরাল অপারেশন চালিয়েছিল। কারকারেকে পরিকল্পনা

মাফিকই পাঠানো হয় কামা হাসপাতালে। বম্বে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কারকারের মৃত্যুর পেছনে হিন্দুত্ববাদী উগ্রপন্থীদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ গ্রহণ করে কেন্দ্রের উত্তর চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তা 'পেন্ডিং' হয়ে যায় সরকারের তরফে এই উত্তরে যে, 'তেমন কিছু থাকলে তা পাওয়া যেত'।

চার

২০০৬ থেকে ২০০৮-এর মধ্যে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণগুলোর তদন্তের কাজ থমকে যায় কারকারের মৃত্যুর ফলে। তাঁর জায়গায় আসেন কে পি রঘুবংশী, যিনি এর আগেও এই পদে ছিলেন। মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্ত রামচন্দ্র কালসাংরা এবং সন্দীপ ডাঙ্গেকে মহারাষ্ট্রের এটিএস রঘুবংশীর নেতৃত্বে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়। চার্জশিটে নাম থাকলেও এরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। তদন্ত আবার গতি পায় ২০১০ সালের মে মাসে। রাজস্থান এটিএস 'আজমের শরিফ' বিস্ফোরণ কেসের তদন্ত করতে গিয়ে দেবেন্দ্র গুপ্ত ও লোকেশ শর্মা নামে দুজন আরএসএস প্রচারককে গ্রেপ্তার করার পর। দেবেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন বিহারের মুজফরনগরে আরএসএস-এর বিভাগ প্রচারক। কারকারের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া যোশী, কালসাংরা আর ডাঙ্গেকে দেবেন্দ্র লজিস্টিক্যাল সহায়তা যোগান। এসব তথ্য পাওয়া যায় গুরু দয়ানন্দের ল্যাপটপ থেকে। লোকেশ শর্মা ছিলেন যোশীর ঘনিষ্ঠ আরএসএস কর্মী। একে জিজ্ঞাসাবাদ করেই প্রথম জানা যায়, এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম মূল ব্যক্তি ছিলেন আরএসএস-এর কেন্দ্রীয় নেতা ইন্দ্রেশ কুমার। রাজস্থান এটিএস ও সিবিআই-এর যৌথ তদন্তে প্রকাশ পায় যে, সন্ত্রাসের কোর গ্রুপে ছিলেন ইন্দ্রেশ কুমার, কালসাংরা, ডাঙ্গে প্রমুখ।

পুলিশ বিভিন্ন রাজ্যে তদন্ত আর গ্রেপ্তারের পর কারকারের অনুসন্ধানের গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং মালেগাঁও বিস্ফোরণ যে 'অভিনব ভারত'-এর কাজ, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। শেষে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে জুড়ে তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য ঐ সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলে। তারা ধরে ফেলে যে, হিন্দু উগ্রপন্থীরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য আর ইজরায়েলের মোসাদ সহ বিদেশের কিছু গোপন ইহুদিবাদী সংগঠনের সঙ্গে মিলে এক বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। এরা সকলেই ইসলামের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করে এবং ভারতে এক পেশীবহুল হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করার বাসনায় তারা হাত মিলিয়েছিল। মহারাষ্ট্র এটিএস-এর পেশ করা চার্জশিটে ইজরায়লে ইহুদি আধিপত্যবাদীদের সঙ্গে 'অভিনব ভারত'-এর যোগাযোগ দেখানো হয়েছে। ২০১০-এর জুনে সিবিআই গুজরাটের ভরত রীতেশ্বর নামে একজন সাক্ষীকে জেরা করে জানতে পারে আরেকজনের কথা। তার নাম স্বামী অসীমানন্দ। আসল নাম নবকুমার, বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে। ধরা পড়েন ২০১০-এর ১৯-শে নভেম্বর। ইনিই সেই ব্যক্তি যার কথা দিয়ে শুরু করেছি। ইনিই বিচারকের সামনে স্বীকারোক্তি করেন। নিজের মৃত্যুদন্ডের ভয়কে উপেক্ষা করে বিচারকের কাছে রাখেন তার মর্মস্পর্শী নিবেদন :

> স্যার, আমাকে যখন হায়দরাবাদের চন্দ্রগুডা জেলে রাখা হয় তখন আমার এক সহবন্দী ছিল কালীম। তার সঙ্গে কথাবার্তায় আমি জানতে পারি, মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণের ঘটনায় তাকে ধরা হয়েছে। সে ইতিমধ্যে দেড় বছর জেলখানায় কাটিয়েছে। জেলে থাকার সময় কালীম আমাকে প্রচুর সাহায্য করে; আমার খাবার, জল ইত্যাদি এনে দিয়ে আমার সেবা করে। কালীমের আচরণ আমার হৃদয় স্পর্শ করে। আমার বিবেক আমায় স্বীকারোক্তি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে নির্দেশ দেয় যাতে প্রকৃত দোষীরা শাস্তি পায়, কোনো নিরপরাধকে যেন ভুগতে না হয়।

হিন্দীতে লেখা ৪২ পৃষ্ঠার স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এরপর অসীমানন্দ হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসবাদীদের নেটওয়ার্কের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। (Tehelka Magazine, Vol 8, Issue 2, Dated January 15, 2011) জানিয়েছেন,

> এই বিস্ফোরণগুলো সংঘটিত হয়েছে যার নেতৃত্বে তিনি হলেন আরএসএস জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য ইন্দ্রেশ কুমার। তিনিই এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণগুলো চালাতে কিছু আরএসএস প্রচারককে তুলে এনে টাকা পয়সা দিয়ে নিযুক্ত করেন।

এরা এরপর মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান ও অন্যান্য জায়গা থেকে আরএসএস, বজরঙ্গ দল, শিবসেনা আর অভিনব ভারত, জয় বন্দেমাতরম, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ইত্যাদি সংগঠনের কর্মীদের যুক্ত করেন। সমগ্র সঙ্ঘ পরিবারই যুক্ত হয়ে পড়েছিল এইসব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে। অসীমানন্দ নিজেও যুক্ত হন দেশের কিছু মন্দিরে আর অন্য জায়গায় কয়েকটি ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীর হামলা চালানোয় ক্ষুব্ধ হয়ে।

পাঁচ

২০০২ সাল থেকে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটে গেছে। ২০০২ সালে ভুপালে তবলিগ জামাত-এর সভায় আসতে থাকা মুসলিমরা, ২০০৩ সালে মহারাষ্ট্রের পরভানিতে মহম্মদিয়া মসজিদ, ২০০৪-এ মহারাষ্ট্রেরই জায়না আর পুমা আর পরে নানদেড় এদের টার্গেট হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে এগুলোকে পাক-মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হামলা বলে সনাক্ত করে বিভিন্ন মুসলিম মহল্লায় হানা দিয়ে বহু যুবককে তুলে আনে। তাদের বিরুদ্ধে শুরু হয় দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, খুন ইত্যাদি মামলা। প্রমাণের অভাবে তাদের অনেকে কয়েক বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, অনেকেই থানার অত্যাচারে পঙ্গু হয়ে গেছে।

৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ শুক্রবার (জুম্মাবার)। সব-এ-বরাতের

দিন বেলা দেড়টায় মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওয়ে ভিড়ে ঠাসা উৎসব পালনরত শহরে চারটে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সন্দেহজনক দ্রুততায় তদন্ত শেষ করে মহারাষ্ট্র এটিএস নব্বই দিনের মধ্যে মালেগাঁওয়ের মুসলিম সম্প্রদায়ের ন'জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়। তাদের বিরুদ্ধে 'মহারাষ্ট্র সংগঠিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন' (MCOCA) নামক ভয়ঙ্কর আইনটি প্রয়োগ করা হয়। এই ন'জন চার বছর জেলে কাটায়। ২০০৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর আবার রমজান মাসে মালেগাঁওয়ের ভিক্কু চকে বিস্ফোরণ হয়। *সিমি* (SIMI)-র বন্ধ অফিসের সামনে মোটরসাইকেলে রাখা বোমাটি ফাটলে ধরে নেওয়া হয় *সিমি*-র লোকেরাই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ইসলামিক সন্ত্রাসের নামে যে আতঙ্কের পরিবেশ গড়ে উঠেছে তাতে কোনো প্রমাণের প্রয়োজন কখনোই হয়নি। কয়েকশো মাইল দূরে গুজরাটের মোদাসায় একই ধরনের একটি বোমা প্রায় একই সময়ে ফাটে। মুসলিম কলোনি সুক্কাবাজারে যখন মসজিদে রমজানের বিশেষ প্রার্থনা হচ্ছিল সেই সময়ে মসজিদের বাইরে বিস্ফোরণটা ঘটে। মালেগাঁওয়ে তিন বছরের এক বালকসহ সাতজন মারা যায়। মোদাসায় মারা যায় ১৫ বছরের এক ছেলে, বহু সংখ্যক আহত হয়। এখানেও গ্রেপ্তার হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা। ২০০৭-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি, শান্তি আলোচনার জন্য পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী খুরশিদ কাসুরির ভারতে আসার মুখে, দিল্লি আর লাহোরের মধ্যে যাতায়াতকারী সমঝোতা এক্সপ্রেসে মধ্যরাতে দুটো শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। কোচগুলো অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়। আরেকটি কোচে রাখা তৃতীয় বোমাটি ফাটেনি। ঘটনায় ৬৮জন নিহত আর বহু সংখ্যক আহত হন। শান্তি আলোচনা জোর ধাক্কা খায়। পাকিস্তানে ঘাঁটি গাড়া সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, প্রধানত হরকত-উল-জিহাদ-ই-ইসলাম (হুজি) এবং লস্কর-ই-তৈবা (লস্কর), এদের দায়ী করা হয়। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টও একে লস্কর আর হুজি-র যৌথ অপারেশন বলে জানায়। এ বিষয়ে অসীমানন্দের জবানি কী বলে দেখা যাক—

> যৌথ মিটিং (রীতেশ্বর, সাধ্বী প্রজ্ঞা, যোশী, ডাঙ্গে, কালসাংরা, লোকেশ শর্মা আর অশোক ওরফে অমিত এদের সঙ্গে) করার পর রীতেশ্বর, প্রজ্ঞা, সুনীল যোশী আর আমি আরেকটা মিটিং করি। আমি বলি, মালেগাঁওয়ের আশি শতাংশ মানুষ মুসলিম, তাই প্রথম বিস্ফোরণটা আমাদের ওখানেই ঘটানো উচিত। আমি আরো বলি, দেশভাগের পর হায়দরাবাদের নিজাম পাকিস্তানে যোগ দিতে চেয়েছিল, কাজেই হায়দরাবাদও একটা ভালো টার্গেট। এরপর আমি বলি, আজমের শরীফ দরগায় হিন্দুরাও বিরাট সংখ্যায় ভীড় করে, কাজেই আজমেরেও আমাদের একটা বিস্ফোরণ ঘটানা দরকার যাতে হিন্দুরা ওখানে যাওয়া থেকে বিরত হয়। আমাদের টার্গেট হিসাবে আমি আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির কথাও বলি।
>
> অসীমানন্দ বলেন, ঐ টার্গেটগুলো সম্পর্কে সকলেই একমত হয়। যোশী বলেন, ''সমঝোতা এক্সপ্রেসে প্রধানত পাকিস্তানিরা ভ্রমণ করে, কাজেই আমাদের উচিত ওটাকেও আক্রমণ করা। যোশী নিজে সেই দায়িত্ব নেন এবং বলেন যে, সেজন্যে রাসায়নিকের ব্যবস্থা করবে ডাঙ্গে...। যোশী হায়দরাবাদে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য আমার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা নেয়। কয়েকমাস পরে যোশী আমাকে ফোন করে বলে খবরের কাগজগুলোর ওপর নজর রাখতে, কারণ একটা ভালো খবর শিগগিরই আসছে। কয়েকদিনের মধ্যে কাগজে মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণের খবর প্রকাশিত হয়। এর ৭-৮ দিন পরে যোশী শাবরি ধামে (গুজরাটে অসীমানন্দের আশ্রম) আসে, সঙ্গে আনে এক তেলেগু কাগজ যাতে ঐ বিস্ফোরণের ছবি ছিল। আমি যোশীকে বলি, কাগজে কয়েকজন মুসলিম ছেলেকে গ্রেপ্তারের খবর বেরিয়েছে। যোশী বলে, এটা আমাদের লোকেরাই করেছে।''

অসীমানন্দের জবানবন্দির গুরুত্ব এইখানে যে, তিনি তার জবানিতে অপরাধী হিসেবে নিজেকেও বারবার প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও ঐ সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া এগোলোনা। কারকারের মৃত্যুর ঠিক একদিন আগে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, তিনি প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে অনুমতি চেয়েছেন তার তদন্ত থেকে পাওয়া কিছু সূত্রকে ধরে এগিয়ে যেতে। তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন, সেনাবাহিনীর মধ্যে এই বিপজ্জনক মতাদর্শ কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হলো না, তিনি নিহত হলেন।

সুবিস্তৃত এই হিন্দু সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক সম্পর্কে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল এর এজেন্ডা : সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দানবীয় করে দেখানো এবং তাদের খতম করা (ethnic cleansing)— যেমন হয়েছিল গুজরাটের গণহত্যায়, ২০০২ সালে। এবং, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ আরো গভীর করে তোলা, আর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধানোর প্ররোচনা সৃষ্টি করা।

এই সমস্ত রহস্যের পুরোপুরি উন্মোচন সম্ভব একমাত্র যদি কারকারের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ঠিকভাবে এগোয়। কিন্তু সেটা প্রায় অসম্ভব আজকের বাস্তবতায়। সামরিক ও অসামরিক প্রশাসন আর আমলাতন্ত্রের গভীরে এই 'দেশপ্রেমিকদের' অনুপ্রবেশ এবং নিরঙ্কুশ কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতা হাতে পেয়ে তারা সেটা নিশ্চয় হতে দেবে না। সেই সঙ্গে তাদের অজস্র প্রচারমাধ্যম আর ওয়েবসাইট একসুরে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ এনে 'দেশপ্রেমিক' সংগীত গাইতে থাকবে।

ইতিমধ্যে হয়তো অসীমানন্দের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়ে গেছে অন্য কোনো আদালতে।

প্রবন্ধ

শকুনির উত্তরাধিকার : ভালচার ফান্ডের কুকীর্তি

মানস

তিন বন্ধু, একজন অ্যাকাউন্টেট, একজন অডিটর ও একজন কর্পোরট ল-ইয়ার একটি রেস্টুরেন্টে খেতে গেছেন। খাওয়ার পর ওয়েটার এসে বিল রেখে গেলে সবার আগে বিলটি ছিনিয়ে নিলেন অ্যাকাউন্টেন্ট। বললেন,

> দেখি তো যোগটা মিলিয়ে, এদের তো কোন বিশ্বাস নেই। যদি জল মিশিয়ে দেয় তবে অনেক বেশি টাকা তোমাদের দিতে হবে, দেখি রাতের ডিনারের পয়সাটা বাঁচিয়ে দিতে পারি কিনা।

ওনার পর অডিটর মহাশয় বললেন,

> আরে এদেরকে তোমরা চেনো না। এরা এত হিডেন কস্ট রাখে না, তা তোমরা কি বুঝবে? আমাকে দেখতে দাও, দেখি তোমাদের এ সপ্তাহের সিগারেট খরচটা বাঁচিয়ে দিতে পারি কিনা।

সবশেষে কর্পোরেট ল-ইয়ার মহোদয় গলা ঝেড়ে বললেন,

> তোমাদের সবার ওই বিলটা দেখা হয়ে গেলে আমি একটা কথা বলি। আমার বিল-ফিল কিছুই দেখার দরকার নেই। তোমরা খালি হার্ট অ্যাটাকের অভিনয় কর পাঁচ মিনিট। তারপর দেখ আমি এই রেস্টুরেন্টকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে কিভাবে তোমাদের সাতপুরুষের খাওয়ার খরচা বের করে আনি।

গল্প হলেও কর্পোরেট ল-ইয়ারদের এহেন পুকুর চুরির ঘটনা ভীষণভাবেই সত্যি। তবে হ্যাঁ, আপনার যদি কোনো কর্পোরেট ল-ইয়ার বন্ধু থাকে তাহলে ভয় পাবেন না। আর আপনি যদি একজন ফিনান্সিয়াল কন্সাল্ট্যান্ট হন তাহলে এহেন বন্ধু লাভের হেতু আপনার উৎফুল্ল হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কেন? কারণ খুব সহজ— আর কয়েকটি সংযোগ মিলে গেলেই আপনারা দুজনে মিলে বিশ্বজয় করতে পারেন। অন্তত পক্ষে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা তো জয় করতেই পারেন। সেই গল্পটাই এবার বলব।

এ লেখায় আলোচনা করবো মূলত দুটি দেশের কথা— একটি জাম্বিয়া ও আরেকটি হলো আর্জেন্টিনা। আলোচনা করতে গিয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করব বললাম বটে কিন্তু *ভালচার ফান্ড* নিয়ে লেখা তো, তাই 'আলো' অপেক্ষা 'চোনা'ই বেশি ঘাঁটতে হবে। কিন্তু সেসব কিছুর আগে জেনে নেওয়া দরকার *ভালচার ফান্ড* কী, এবং কেন। কিন্তু তারও আগে এই ভালচার ফান্ড ধরনের সংস্থাগুলির কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বুঝতে গেলে আমাদের একটু হলেও চোখ বুলিয়ে নিতেই হবে গত ৩০-৪০ বছরের পুঁজিবাদের বিকাশের ধারাতে।

পুঁজিবাদের আধুনিকতম রূপ

যদি একটু পেছনের দিকে তাকাই আর পুঁজিবাদের বিকাশের পথটিকে যদি মোটামুটি দুভাগে ভাগ করতে চাই তাহলে সত্তরের দশকের আগে ও পরে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলত দুটি ধারা দেখতে পাব। সত্তরের দশকের আগের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সরকার বা স্টেট-এর একটি বড় ভূমিকা ছিল। এটি সম্ভব হয়েছিল বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যার গভীর বিশ্লেষণে যাওয়ার সুযোগ এ লেখায় নেই। আপাতত এটুকুই বলে রাখা প্রয়োজন যে সত্তরের দশক অবধি বিশ্ব-পুঁজিবাদের পীঠস্থান আমেরিকান অর্থনীতিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা রেগুলেশান বেশ শক্তপোক্ত ছিল। ফিনান্সিয়াল ক্ষেত্র, ব্যাংক, এদের হাত-পা 'গ্লাস-স্টিগাল'* অ্যাক্ট দিয়ে একেবারে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এই অ্যাক্ট এবং আরও অন্যান্য সরকারি নিয়ম নীতির বলে ব্যাংক-এর কাজ ছিল লোন দেওয়া-নেওয়া করার মতোই সহজ এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য। কিন্তু সত্তরের দশক থেকেই পুঁজিবাদ তার পোষাক পাল্টায়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজমের জায়গা নেয় ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটালিজম। অর্থাৎ পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ কাঠামোয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। আগে যেখানে পুঁজিপতিদের মোট আয়ের বেশিরভাগ আসত শিল্পক্ষেত্র থেকে, সেখানে ধীরে ধীরে শিল্পক্ষেত্রের স্থান নিয়ে নেয় ফিনান্সিয়াল ক্ষেত্রটি। বিনিয়োগের উপর রিটার্ন শিল্পক্ষেত্র অপেক্ষা বেড়ে যায় ফিনান্সিয়াল ক্ষেত্রটিতে। ফিনান্সিয়াল ক্ষেত্রটি কী নিয়ে গঠিত? মূলত এর মধ্যে পড়ে ব্যাংক, হেজ ফান্ড, মিউচুয়াল ফান্ড, নন-ব্যাঙ্ক ফিনান্সিয়াল ইনটারমিডিয়ারি ইত্যাদি। এরা কী নিয়ে কাজ করেন? শেয়ার, বন্ড, কারেন্সি। এছাড়াও আরও অনেক অনেক 'ফিনান্সিয়াল প্রডাক্ট', যেমন মর্টগেজ বেসড সিকিউরিটি, ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপ, ডেরিভেটিভস ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দের মানে এই লেখাটির মূল বক্তব্যটি বোঝার জন্য খুব একটা প্রয়োজন নেই, তাই এখানে আর এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল না, শুধু উল্লেখ করা হল। শুধু এটুকু বলে নেওয়া ভালো যে অত্যন্ত জটিল সমস্ত জিনিসপত্র এবং অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি অঞ্চল এই ফিনান্সিয়াল ক্ষেত্রটি। এই সবগুলির মূল কথা হলো এই যে, হাজারটা সমীকরণের সমাধান করে আপনাকে দেখানো হবে যে আপনার বিনিয়োগের রিটার্নটা আপনি ভালো পাবেন। অর্থাৎ

***গ্লাস-স্টিগাল অ্যাক্ট** : এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং সংক্রান্ত একটি আইন (১৯৩৩) যার দ্বারা ব্যাংকের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়। লোন দেওয়া নেওয়া ছাড়া অন্যান্য ফাটকাবাজি থেকে ব্যাংককে বিরত রাখার জন্যই এই আইন করা হয়েছিল। এই ফাটকাবাজির কুফল দেখা গিয়েছিল ১৯২৯ এর মহা-মন্দায়, তাই এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু ফিনান্স লবির চাপে ধীরে ধীরে এই আইনকে লঘু করা হয়। ১৯৯৯ সালে এই আইন তুলে দেওয়া হয়।

টাকা দিয়ে টাকা করার জটিল একটি প্রক্রিয়া।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য আলোচনা করে নেওয়া যাক। 'ফর্বস ৪০০' অর্থাৎ বিশ্বের সর্বাধিক ৪০০ জন ধনীর তালিকা ঘেঁটে নিম্নলিখিত আকর্ষক তথ্যটি পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৮২ সালে এই ৪০০ জন সুপার-রিচ বা অতি-ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে বেশিরভাগের (২২.৮%) আয়ের মূল উৎস অর্থাৎ মোট আয়ের বেশিরভাগটাই আসত 'খনিজ তেল ও গ্যাস'-এর ব্যবসা থেকে। কিন্তু ২০০৭ সালে এসে দেখা যাচ্ছে যে এদের মধ্যে বেশিরভাগের (২৭.৩%), মোট আয়ের বেশিরভাগটাই আসছে ফিনান্স থেকে। আর ফিনান্সের সঙ্গে রিয়াল এস্টেট জুড়ে দিলে এই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৩৪%। অর্থাৎ ধনীতম পুঁজিবাদীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশেরও বেশি মূলত ফিনান্সিয়াল পুঁজিবাদী। ফলত সরকারি-বেসরকারি সমস্ত ক্ষেত্রেই এদের ক্ষমতা আজ অপরিসীম। ওবামা, বুশ, ক্লিনটন এদের সকলেরই মুখ্য উপদেষ্টা যারা হন তাঁরা আজ এই ফিনান্স লবির লোক, আগেকার মতো তেল বা অন্যান্য ভারী-শিল্প লবির লোক নন। এদের হাতেই আইন-আদালত-আমলা-শামলা সবকিছু। আদালত এদের কুকীর্তির প্রতি অন্ধ হয়ে থাকে। ২০০৮ সালের ঐতিহাসিক সঙ্কটের সময়ও করদাতাদের টাকা নিয়ে ওয়াল স্ট্রিটে বোনাস দেওয়া হয়। এদের যে সমস্ত কুকীর্তির দরুন ২০০৮ সালের সঙ্কট উপস্থিত হয় সেই সমস্ত কুকীর্তিকে সুচারুভাবে ঢেকে ফেলার সুবন্দোবস্ত করে মার্কিন সরকার। এবার আসব এদেরই কুকীর্তি নিয়ে কিছু কথায়।

দুই দেশের গল্প

মহাভারতে দুর্যোধনের কোন একটি খুনজখমের পরিকল্পনা শুনে শকুনি বলছেন, "বাছা, সব সময় যুদ্ধ রক্তপাত দিয়ে জেতার প্রয়োজন হয় না। একটি অস্ত্র আছে যা দিয়ে তুমি বহু যুদ্ধ বিনা রক্তপাতেও জিততে পারো। ছল। অস্ত্রটি হল ছলনা।" দুর্যোধন সম্ভবত বোঝেননি কিন্তু শকুনির নতুন অবতার বা শকুনির উত্তরাধিকারী *ভালচার ফান্ডের* পরিচালকেরা একথাটা বেশ বুঝেছিলেন। *ভালচার ফান্ড হলো* সেই ফিনান্সিয়াল এজেন্সি যারা গরিব ঋণ-জর্জরিত বিভিন্ন দেশের অপরিশোধিত ঋণ কিনে নেয় ঋণদাতাকে অত্যন্ত সস্তায় ঋণ শোধ ক'রে, আর তারপর ওই গরিব দেশটিকে আদালতে টেনে আনে এবং তার কাছ থেকে সুদ সমেত পুরো টাকাটা আদায় করে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২০০৫-০৬ নাগাদ 'ডেট অ্যাডভাইসারি ইন্টারন্যাশনাল' বলে একটি কোম্পানি দেখে জাম্বিয়া, যেটি আফ্রিকার অত্যন্ত দরিদ্র একটি দেশ, সেই জাম্বিয়ার একটি ঋণ রোমানিয়ার কাছে বহুদিন বাকি পড়ে আছে। এই কোম্পানিটি রোমানিয়া সরকারকে বলে যে জাম্বিয়া তো এই টাকাটা মেটাতে পারবে না, তার চেয়ে আমি এর ১১% দিচ্ছি, আমায় এই লোনটা বেচে দিন। রোমানিয়া সরকার দেখে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। তারা লোনটা বেচে দেয়। আর তারপর ২০০৬ সালেই লন্ডনের কোর্টে এই কোম্পানিটি টেনে নিয়ে যায় জাম্বিয়াকে। এবং আন্তর্জাতিক আইনের ফাঁকফোকর গলে কেসটা জিতেও যায় এবং জাম্বিয়া সরকারকে বাধ্য করে ৭ লক্ষ মার্কিন ডলার এই কোম্পানিকে শোধ করতে। ৭ লক্ষ মার্কিন ডলার, যা কিনা জাম্বিয়ার গরিবদের খাদ্য ভর্তুকির সাত গুণ। একটা হতদরিদ্র দেশের ততোধিক দরিদ্র মানুষের সাত বছরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিল এই ডিডিএ নামক *ভালচার ফান্ড*। কোন অস্ত্র নয়, ডেল্টা ফোর্স* নয়, কিছুই লাগল না। ঠান্ডা ঘরে বসে কলমের খোঁচায় একটা গরিব দেশকে ঠেলে দেওয়া হলো আরও দারিদ্র্যের অন্ধকারে, আর ধনী হলো আরও ধনী। এটাই আজকের ধনতন্ত্র, যেখানে চারিদিক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ফিনান্স আর ফাটকা পুঁজি। ফলে সত্তর দশক থেকে ক্রমশ উঠে গেছে 'গ্লাস-স্টিগাল' তথা আরও প্রয়োজনীয় বেশ কিছু পুঁজি-নিয়ন্ত্রক আইন।

২০১৪ আর্জেন্টিনা। গল্পটা মোটামুটি একই, খালি ডিডিএ-র জায়গায় অন্য একটি কোম্পানি, যার নাম 'এনএনএল'। তারা আর্জেন্টিনাকে নিউইয়র্কের কোর্টে নিয়ে গিয়ে বলছে ১৩০ কোটি মার্কিন ডলার এই কোম্পানিটিকে দিতে। আর্জেন্টিনা সরকার এখনও রাজি হয়নি। দড়ি টানাটানি চলছে। কী হবে শেষমেষ বলা মুশকিল।

এ তো শুধু দুটো উদাহরণ দিলাম। এই ধরনের কোম্পানিগুলি এই ধরনের কেনাবেচা রোজই করে থাকে। কেউ জানতেও পারে না। এদের পকেটে থাকে আদালত ও সরকারি আমলারা, যারা এদেরকে গোপন তথ্যগুলি দেয়। এছাড়াও থাকে অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের নেটওয়ার্ক। যার ফলে এরা দেশের সার্বভৌম ঋণ বা 'সভরেন ডেট'গুলিকে কেনাবেচা করতে পারে।

শেষের কথা

রোজা লুক্সেমবার্গ ও ডেভিড হার্ভের তত্ত্বায়ন অনুসারে পুঁজির অ্যাকুমুলেশন দুভাবেই সম্ভব। এক, ক্লাসিকাল মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে শ্রমিক শোষণের মাধ্যমে। আর দুই, 'ডিস্‌পজেশন'— যার মধ্যে পরে জোর খাটিয়ে সম্পদ যেমন জমি কেড়ে নেওয়া, ঠকিয়ে ছলনার দ্বারা একটি দেশের সম্পদ লুঠ করে নেওয়া— যেটা জাম্বিয়া তথা আফ্রিকার বহু দেশ যেমন আইভরি কোস্ট, কঙ্গো ইত্যাদির ক্ষেত্রে হয়েছে। যার ফলে আফ্রিকা ক্রমশ ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশে পরিণত হয়েছে।

তাই আজকের পুঁজিবাদকে বুঝতে গেলে এই ফিনান্স বা ফাটকা পুঁজির জটিল গতিবিধি এবং বাস্তবের মাটিতে এর প্রভাবকে বুঝে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। নচেৎ গঙ্গা থেকে মিসিসিপি ভালচার ফান্ডের মতো শকুনির উত্তরাধিকারীরা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞায় তাঁদের লুঠতরাজের কুরুক্ষেত্র চালিয়ে যাবে।

***ডেল্টা ফোর্স** : আমেরিকার সেনাবাহিনীর স্পেশাল অপারেশানের জন্য তৈরি একটি শাখা

প্রবন্ধ

বিবেকানন্দের নারী ভাবনা

এষা বসু

উনবিংশ শতকে বঙ্গদেশে যে হিন্দু অভ্যুত্থান হয়েছিল তার ফসল বিবেকানন্দ। তিনি বর্তমান যুগের 'অবতার' রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হিন্দু ধর্ম প্রচার করতে সারা ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করেন। এই প্রব্রজ্যার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-ধর্ম-ভারতীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার যার সঙ্গে আত্মঘোষণা তথা ভারতের মহিমা প্রচার জড়িয়ে রয়েছে। এই সময় তিনি অজস্র বক্তৃতা দিয়েছেন, যার বিনিময়ে তিনি ডলার উপার্জন করেছেন এবং ভুরি ভুরি পত্র লিখেছেন কখনো দেশের গুরুভাইদের বা রাজা-রাজড়াদের উদ্দেশে কখনো বিদেশি শিষ্য-শিষ্যাদের উদ্দেশে। এইসব লেখা এবং বক্তৃতা থেকে তাঁর নারী বিষয়ে কী ভাবনা ছিল তা আমরা দেখবো এই প্রবন্ধে।

ব্রহ্মচর্যের বাতিক

বিবেকানন্দ বলছেন,

> বুদ্ধের বাণী শুনুন— বিপুল তাৎপর্যময় বাণী। আমাদের হৃদয়ে এর একটি স্থান। বুদ্ধ বলছেন, "স্বার্থপরতা ও যা কিছু তোমায় স্বার্থপর করে তা নির্মূল কর। দারা, পুত্র, পরিবার রেখো না। বিষয়ী হয়ো না। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও।" "বিষয়ী লোক মনে করে সে নিঃস্বার্থ হবে, কিন্তু স্ত্রীর মুখ দেখলেই স্বার্থপর হয়ে যায়। মা মনে করে সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হবে, কিন্তু বাচ্চার দিকে চাইলেই স্বার্থপরতা আসে। যেই কোন স্বার্থপর কাজ করা হল, অমনি গোটা মানুষটা, আসল মানুষটা বরবাদ হয়ে গেল: সে পশুর মত, দাসের মত, সঙ্গী মানুষদের সে ভুলে যায়, সে আর বলে না তুমি প্রথমে আমি পরে।

উত্তম প্রস্তাব, 'তুমি আগে আমি পরে'। আমরা স্বপ্ন দেখি সেই সমাজের, মানুষ নিবেদিতপ্রাণ হবে অপরের জন্য। কিন্তু দারা-পুত্রাদির বিরোধিতা করলে মনুষ্যকুল তো নিঃশেষ হয়ে যাবে! আমরা কি মনুষ্য বংশ ধ্বংস করার দিকে এগিয়ে যাব? এটি অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক শুধু নয়, অমানবিক ভাবনা।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ তরজা একটু তুলে ধরা যাক। বিবেকানন্দ বরাবর বিদ্যাসাগরের বিরোধী শুধু ছিলেন না, বিদ্বেষ প্রকাশ করতেও পিছপা হননি।

> বিদ্যাসাগরের প্রতি রামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রধান প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দের বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্য কোনদিনই কমেনি, বরং বেড়েই উঠেছিল। এই তাচ্ছিল্য আর বিদ্বেষের একটা তীব্র বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিবেকানন্দের ১৮৮৭ সালের ৮ই মের মন্তব্যে—
>
> মাস্টার— বিদ্যাসাগর বলেন... আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুজি না, আবার পরকে কি লেকচার দেব?
>
> নরেন্দ্র— যে এটা বোঝেনি, সে আর পাঁচটা বুঝলে কেমন করে?
>
> মাস্টার— আর পাঁচটা কি?
>
> নরেন্দ্র— যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল করে ছেলেদের বিদ্যা শিখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেলেমেয়েদের বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে?

বিদ্যাসাগরের বয়স তখন সাতষট্টি, নরেন্দ্রনাথের চব্বিশ। অথচ কী অসীম ঔদ্ধত্যে তিনি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। তাঁর এই বক্তব্যের পিছনে শুধু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নয়, একটা গূঢ় ধারণাও কাজ করেছে। সেটা হলো, ব্রহ্মচর্য। বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাদর্শে নৈতিকতা, সততা, দৃঢ়তা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেও প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য আদর্শকে একেবারেই প্রশ্রয় দেননি। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবিত ভাবধারার একটা ভিত্তিই হচ্ছে ব্রহ্মচর্যের আদর্শ, যার মূলে আছে যৌন পাপের ভীতি এবং স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা। স্বাভাবিক বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা মানুষকে অন্য সমস্ত কিছুর মতো যৌনতার প্রতিও একটা সাগ্রহ, সুস্থ ও সুষম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে প্রণোদিত করে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তদের মধ্যে যৌনতাকে সর্বপ্রযত্নে পরিহার করার অসুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিলো।

বিদ্যাসাগর জীবনের প্রতি এরকম অসুস্থ ও অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রশ্রয় দেননি। আর সেই কারণেই তাঁর শিক্ষাদর্শ নিয়ে এত বিদ্রূপ করেছেন নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথের ঐ বিদ্রূপোক্তিকে তাই 'ক্রুদ্ধ যুবকে'র বয়সোচিত হঠকারিতা বলে উড়িয়ে দেওয়ার জো নেই। আমৃত্যু তিনি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের আদর্শের প্রতি আন্তরিক বিরাগ পোষণ করেছেন।

বুদ্ধদেব বা বিবেকানন্দ যেই হোন 'মানুষ' বলতে পুরুষকে বুজিয়েছেন— "স্ত্রীর মুখ দেখলেই স্বার্থপর হয়ে যায়", কিন্তু স্বামীর মুখ দেখলে যে নারী স্বার্থপর হতে পারে সে চিন্তা তাঁদের আসে না। আমরা সামগ্রিকভাবেই এই চিন্তার বিরোধিতা করছি।

নারীর সতীত্ব কীর্তন

বিবেকানন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,

> কোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি হচ্ছে নারীর প্রতি আচরণ, ...আধুনিক হিন্দু নারীর জীবনের প্রধান ভাব হচ্ছে তার সতীত্ব, স্ত্রী হচ্ছে এক বৃত্তের কেন্দ্র, যার স্থিরত্ব নির্ভর

করে তার সতীত্বের উপর। হিন্দু বিধবাদের সহমরণের কারণ হচ্ছে এই ভাবের চরম অবস্থা, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের চেয়ে হিন্দু নারীরা সম্ভবত বেশি আধ্যাত্মিকতা সম্পন্না ও ধর্মশীলা। যদি আমরা তাদের ওইসব সদগুণ বজায় রাখতে পারি এবং সেই সঙ্গে আমাদের নারীদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত করে তুলতে পারি তাহলে ভবিষ্যতের হিন্দুনারী জগতের আদর্শ নারী হয়ে উঠবে।

সুতরাং নারীর মানুষ হিসাবে পরিচয় প্রধান কথা নয়— সে নারী, সে সতী, এই তার পরিচয়। অর্থাৎ সতীত্ব পালন ছাড়া আর কোন গুরুত্ব তার নেই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তাই ভাবে, নইলে উত্তরাধিকারী নিয়ে সংশয় থেকে যায়— যা নৈব নৈব চ।

১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে বিবেকানন্দ 'প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগে ভারতের নারী বিষয়ে' বক্তৃতা করেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন—

> ভারতে নারী ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রকাশ, নারীর সমস্ত জীবনে একটিই চিন্তা ক্রিয়াশীল, যে তিনি মা এবং আদর্শ মা হতে গেলে পবিত্র থাকা কর্তব্য। ভারতের কোন মাতাই তাঁর সন্তানকে ত্যাগ করেন না, এই বলে তিনি এর বিপরীত প্রমাণ দেখাবার জন্যে সকলকে আহ্বান জানান। ভারতের মেয়েরা যদি মার্কিন তরুণীদের মতো তাদের শরীরের অর্ধাংশ যুবকদের কুৎসিত দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত রাখতে বাধ্য হতো তবে তারা মৃত্যু বরণ করতো।

নারীর অস্তিত্ব একমাত্রিক মা, সমাজে তার ভূমিকা শুধু সন্তান উৎপাদনের, আর 'পবিত্র' মানে কি এক্ষেত্রে একমাত্র সতীত্ব নয়? নারীকে ঠেলে দেওয়া হল পর্দার আড়ালে আর পুরুষের বাইরের জগৎ থাকলো উন্মুক্ত বহু নারী সম্ভোগের জন্য। বঞ্চিত নারী আর তার পাশাপাশি 'স্বামীর জীবন হেটোয়ারিজম সুশোভিত'। এটা শুধু ভারতে নয় সারা বিশ্বেই। যখন ব্যক্তিমালিক এসেছে, পুঞ্জীভূত হয়েছে উদ্বৃত্ত সম্পদ, তখন থেকেই নারীর জন্য এই ব্যবস্থা। পরে এই বিষয়ে আরো কিছু বলব, এখন বিবেকানন্দের প্রশ্নের উত্তর দিই। ভারতীয় নারীরা কখনো 'সন্তানকে ত্যাগ করেননি'— তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ কুন্তী কর্তৃক কর্ণকে ত্যাগ, উর্বশী কর্তৃক শকুন্তলাকে ত্যাগ। সেই বিচারে কুন্তী আদর্শ মা না হলেও পুত্র কর্ণ বহুগুণসমন্বিত আদর্শ সন্তান তথা মানুষ। তবে কেন তাঁরা মা হয়ে সন্তানকে ত্যাগ করলেন সেটি কিন্তু এক্ষেত্রে আলোচনার দাবি রাখে। তা হলো সমাজের চাপ, পিতৃতন্ত্রের চাপ— এই জন্য তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন সন্তানকে ত্যাগ করতে। আর ভারতীয় নারীরা আজও সদ্যোজাত শিশুকে ত্যাগ করে চলেছেন— সেই একই কারণে। এটি শুধু ভারতের কথা নয়, সমগ্র বিশ্বেরই একই চিত্র। নারীর 'অবৈধ' সন্তানকে সমাজ মেনে নেয় না। আর ''নারীরা তাদের শরীরের অর্ধাংশ যুবকদের কুৎসিত দৃষ্টির সামনে মেলে ধরতে বাধ্য হলে মৃত্যুবরণ করতো''— সে যুগের পক্ষে বিবেকানন্দের মত গ্রহণযোগ্য, এবং এযুগের পক্ষেও তাই— যখন কোন নারীকে বাধ্য করা হয় তার শরীর দেখাতে (নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানো বা মারা) তারা অনেকেই আত্মহত্যা করে বা মানসিক চাপে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এযুগে আবার অনেক ভারতীয় নারীই স্বেচ্ছায় তিন-চতুর্থাংশ শরীর বার করেও লজ্জিত হয় না। মার্কিন নারীরাও স্বেচ্ছায় শরীর দেখায়, সেখানে বাধ্যবাধকতা নেই, তাই মৃত্যু বরণ করার কোন প্রসঙ্গ আসে না। তিনি নিজেই মার্কিন নারীদের সম্পর্কে লিখেছেন, ''নারী বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও এমন স্বাধীন, এমন শিক্ষিত, এবং এমন সংস্কৃতিসম্পন্ন নেই।'' যে স্বাধীন সে নিশ্চয় পোষাক কী পরবে নিজেই নির্বাচন করবে, সেখানে বাধ্যবাধকতা থাকবে না। আর পুরুষের 'কুৎসিত দৃষ্টি'? পুরুষের কি নিজেদের এত ছোট করতে আত্মমর্যাদায় লাগে না? আর পুরুষের 'কুৎসিত' দৃষ্টির দায় পুরুষের, মেয়েদের নয়।

নারীর সম্পত্তির অধিকার

বোস্টন হেরাল্ড ১৫ই মে ১৮৯৪ সালে লেখে বিবেকানন্দ বিষয়ে, তিনি বলছেন—

> আপনাদের ধারণা আমরা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি। পৃথিবীর কোন্ জাতি তার নারীদের লাঞ্ছনা করেনি?

—লাখ কথার এক কথা।

> ইউরোপ বা আমেরিকায় শুধু অর্থের লোভে লোকে বিয়ে করে। বিয়ের পর স্ত্রীর অর্থ আত্মসাৎ করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। বিপরীতভাবে ভারতবর্ষের কোন মহিলা অর্থের প্রয়োজনে বিয়ে করলে তার সন্তান-সন্ততি দাস হিসাবে পরিগণিত হয়, আমাদের বিধি এরকমই। কোন ধনী লোক বিয়ে করলে তার যাবতীয় অর্থ স্ত্রীর কাছে হস্তান্তরিত হয়। ফলে অর্থরক্ষিকা এই স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা লোকটির হয় না।... বিগত হাজার বছর ধরে ভারতীয় মহিলারা সম্পত্তির অধিকার ভোগ করে এসেছে... ভারতবর্ষে মৃতব্যক্তির সমস্ত ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন তাঁর স্ত্রী।

ট্রিবিউন পত্রিকা ১লা এপ্রিল ১৮৯৪ সালে তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে লিখেছে—

> হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে বক্তা বলেন যে বিয়েতে পাওয়া যৌতুক স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তাতে স্বামীর কোন অধিকার নেই। স্বামীর অনুমতি ছাড়া সে তা বিক্রি অথবা দান করতে পারে। অন্য সূত্রে বা স্বামীর কাছ থেকেও সে যে উপকার পায় তা তার নিজস্ব সম্পত্তি এবং স্বেচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে।

ভারতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী মৃত ব্যক্তির স্ত্রী— এটি কোন সময় ছিল? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ প্রফুল্লময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৪০) 'আমাদের কথা'য় লিখেছেন—

> বলু মারা যাওয়াতে এবং স্বামী উন্মাদ হওয়ার জন্য আমরা

আমাদের বিষয় হইতে বঞ্চিত হইলাম। যতদিন আমরা বাঁচিয়া থাকিব ততদিন পর্যন্ত এই বাড়ির একটা অংশ ভোগ করিবার অধিকার এবং মাসহারা পাইবার ব্যবস্থা হইল। এই বন্দোবস্তের ভিতরেই আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলাম, কিন্তু দিন দিন সকল জিনিসই অত্যন্ত দুর্মূল্য হওয়ার দরুন সেই সামান্য অর্থে সংসার নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইলে আমাদের বাড়ির অংশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম।

একেই বলে স্ত্রীর উত্তরাধিকার! কোন ধনী লোক বিয়ে করলে তার যাবতীয় অর্থ স্ত্রীর কাছে হস্তান্তরিত হয়— একথা যদি সত্য বলে ধরে নিই তবে জমিদারবাবুরা বাগান বাড়িতে রাত কাটাতে যাওয়ার পয়সা কোথায় পেতেন? নাকি ধরে নেবো সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা স্বামীকে সাজিয়ে গুছিয়ে পয়সাকড়ি দিয়ে আমোদ করতে পাঠাতেন পতিগতপ্রাণা বলে? তিনি আরো বলছেন, ‘‘কোন মহিলা অর্থের প্রয়োজনে বিয়ে করলে’’... শুধু ভারতে নয় সারা বিশ্বেই মহিলারা অর্থের প্রয়োজনে বিয়ে করে— সিমোন বলছেন, মেয়েদের পক্ষে ‘‘বিবাহ অন্য অনেক কিছুর চাইতে অনেক বেশি সুবিধাজনক জীবিকা,’’ আর মেয়েরা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতো বলেই পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার আইন করতে হয়। ‘বিয়েতে পাওয়া যৌতুক স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি’— এখনও বিয়েতে পণ-যৌতুক-গহনা ইত্যাদি চলে আসছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে একটি মাত্র প্রশ্ন থাকে— পাত্রপক্ষ বিয়েতে চাপ দিয়ে যে গহনা বা অন্যান্য জিনিসপত্র আদায় করে তা কি সেই বধূটির ইচ্ছেমতো দানখয়রাত করবার জন্য বা নিজের ইচ্ছামতো বেচে দেবার জন্য?

এই বিষয়ে সে সময়কার এক বিখ্যাত পরিবারের কন্যা প্রসন্নময়ী কিছু তথ্য দিয়েছেন তাঁর আত্মজীবনী ‘পূর্ব্বকথা’ গ্রন্থে। তিনি লেখেন—

নিঃসন্তান বালবিধবা পিতৃস্বসাঠাকুরানীদিগের মধ্যে দুই একজনের একাধিকবার শ্বশুরালয়ে যাওয়া ও বৈধব্য ঘটিয়া সর্বস্বান্ত অবস্থায় পুনর্বার পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী প্রাচীনাদের প্রমুখাৎ আজও শুনিতে পাওয়া যায়, সে দুর্ভাগ্যের ইতিহাস জনসমাজে অজ্ঞাত থাকাই বাঞ্ছনীয়। বাধ্য হইয়া কুলীন পাত্রে বংশানুক্রমে কন্যাদান করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা পতিপুত্রহীনা তাঁহার আজীবন পিতৃগৃহবাসিনী ও পিতার গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী এবং ভ্রাতাগণের চিরহিতৈষিণী ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর বিষয়সম্পত্তি ভাই ভাইপোগণই আবার ফিরিয়া পাইতেন, দলিলের লেখাপড়াও সেইপ্রকার থাকিত।

হিন্দুর অপূর্ব্ব আইনানুসারে ছোটদিদি গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র পাইয়া শ্বশুরালয় থাকিতে শিশুকন্যা লইয়া বিধবা হইয়া পুনর্ব্বার মাতুলালয়ে কতকদিন আসিয়া রহিলেন, তাঁহার সেই শোকের ক্রন্দন ও সর্বত্যাগ কাহিনী বর্ণনাতীত।

ত্রিপুরার বিখ্যাত রাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের রাজবৈদ্য ছিলেন চন্দ্রকুমার। তাঁর স্ত্রী আমোদিনী দাশগুপ্ত লিখছেন—

আমার বিবাহের সময় সপত্নীদের বস্ত্র অলংকার যাহা ছিল সমস্তই আমাকে দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া আমার ছোট জায়ের এবং বড় সপত্নীর ছোট ছেলের অতিশয় হিংসা হইয়াছিল। আমার স্বামীর মন যোগাইতে আমি জানিনা বলিয়া স্বামী রাগ করিয়া বাড়ি হইতে যাইবার সময় কতক বস্ত্র অলংকার সঙ্গে নিয়া যান। কতক আমার শাশুড়ির নিকট রাখিয়া যান। বলিয়া যান যে উহাকে এই সকল জিনিস দেব না, ছেলেদের বিবাহ দিয়া বধূদিগকে দিব।

বিবেকানন্দের বক্তব্য সমর্থন করছে কি?

নারী প্রগতির হোতা পশ্চিম

বিবেকানন্দই আবার বলছেন—

এরপর বৌদ্ধধর্মে বলা হলো পবিত্রতার কথা, একমাত্র সংগ্রাম দেখা দিল— তা হলো পবিত্রতা রক্ষার সংগ্রাম। সমস্ত দোষ চাপান হল স্ত্রীলোকদের উপর। এমন কি প্রবাদবাক্যগুলিতেও তাদের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ করা হল। নরকের দ্বার কি? তার উত্তর হল নারী। আর একটিতে বলা হলো— ‘কোন বন্ধন আমাদের সকলকে ধূলার সঙ্গে আবদ্ধ রাখে?’ ‘নারী’। আর একটিতে বলা হলো— ‘কোন ব্যক্তি অধশ্রেষ্ঠ? সে নারীর দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়’।

পশ্চিমী ধর্মগুলিতেও এ ধরনের মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। যে কোন ধরনের সন্ন্যাসজীবনের অগ্রগতির অর্থ ছিল নারীত্বের অবমাননা।

কিন্তু ঘটনাক্রমে নারীত্বের আর একটি ধারণার সৃষ্টি হল। পশ্চিমে এ ধারণার আদর্শ রূপায়িত হলো স্ত্রীর মধ্যে, ভারতবর্ষে মায়ের মধ্যে... আমি অকপটভাবে স্বীকার করতে বাধ্য যে পশ্চিমে নারী প্রগতির হোতা ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল এবং বিপ্লবী ফরাসী দার্শনিকরা।...

মুসলমান রমণীরা তাদের পশ্চিমী বোনেদের তুলনায় অনেক পৃথক, কারণ তাদের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তির অগ্রগতির ততটা বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি না। কিন্তু তার জন্য মনে করার কোন কারণ নেই যে মুসলিম স্ত্রীলোকেরা অসুখী।

তিনি এখানে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছেন— ধর্ম যে নারীকে দোষারোপ করেছে তিনি তা স্বীকার করছেন এবং বিরোধিতা করছেন। এখানে তাঁকে আমরা দেখি পশ্চিমী নারীমুক্তির সমর্থক হিসাবে। আবার হঠাৎ বললেন মুসলিম নারীরা সুখী— কার্যকারণ ছাড়াই।

আর এক সময় বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বলেন—

বহু আলোচিত বিবাহ বিষয়ে হিন্দুরা সমাজতান্ত্রিক এবং সমাজের কল্যাণের কথা না ভেবে যুবকযুবতীর পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ থাকার ফলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াটা তারা মোটেই ভাল চোখে দেখে না, কারণ যে কোন দুটি মানুষের

কল্যাণের চেয়ে সমাজের কল্যাণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীজী বলেন—

আমি জেনিকে ভালবাসি এবং জেনি আমাকে ভালবাসে, তাই আমরা বিয়ে করবো এটা কোন কারণ নয়।

বিধবা বিবাহের বিরোধিতা

বালবিধবাদের অবস্থার সে শোচনীয় বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তা অস্বীকার করে তিনি বলেন যে, ভারতে বিধবাদের সাধারণ-ভাবেই বিশেষ প্রতিপত্তি। কারণ সে দেশে বিষয়সম্পত্তির বড় অংশ বিধবাদের করায়ত্ত। প্রকৃতপক্ষে বিধবারা নাকি এমন একটি স্থান অধিকার করে আছে যে, মেয়েরা বা পুরুষেরা হয়তো পরজন্মে বিধবা হবার জন্য সম্ভবত প্রার্থনা করতে পারে।

বাল-বিধবা যে নারীরা বাল্যকালেই বাগদত্তা এবং বিবাহের পূর্বেই বালক-স্বামী মৃত তাদের প্রতি করুণা করা চলতো, যদি বিবাহই জীবনের মূল উদ্দেশ্য হতো; কিন্তু হিন্দু চিন্তাধারা অনুসারে বিবাহ বরং একটি কর্তব্য কোন বিশেষ সুযোগ নয় এবং বাল-বিধবাদের পুনর্বিবাহে অধিকার না দেওয়া বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার নয়।

এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করার আছে। সমাজতন্ত্র সমাজের মঙ্গলের কথা ভাবে কিন্তু সমাজ কি ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে? বঙ্কিম স্পষ্টতই বলেছেন— রাম, শ্যাম, যদু মধুর যাতে কল্যাণ সমাজের তাতেই কল্যাণ। প্রতিটি বিবাহ যদি সুখের হয় তাহলে সমাজের মঙ্গল বই কি? জাতবিচার করে, কুষ্ঠি মিলিয়ে আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে বিয়েই কি কাম্য? এটিকে তো এঙ্গেলস্ বলেছেন 'সুবিধার বিয়ে'। ভালবাসাহীন দাম্পত্য কীভাবে সমাজের মঙ্গল করবে? সন্তানের সামনে কোন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করবে অসুখী দাম্পত্য?

আর বিধবা বিবাহ? যাঁরা বিশেষ কিছু লেখাপড়া জানেন না তাঁরাও বিধবাদের যন্ত্রণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং সেই যন্ত্রণা থেকে তাদের উদ্ধারের জন্য বিদ্যাসাগর জীবনভর যে লড়াই চালিয়েছিলেন তা প্রায় কিংবদন্তী তুল্য। আর 'বিধবাদের সাধারণভাবে যথেষ্ট প্রতিপত্তির' কারণে বাড়ী থেকে কাশী অথবা বৃন্দাবনে বিতাড়িত হতে হত এবং সেখানে ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ করতে হত। এই সামাজিক বিষয়টি শরৎচন্দ্রকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং তাঁর রচনায় তার ছাপ আছে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁর *মহাস্থবির জাতক* উপন্যাসে বৃন্দাবনে বিধবাদের ভিক্ষা করার মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন।

স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় সারাজীবন শিক্ষার প্রচার প্রসার চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, বিভিন্নভাবে নারী আন্দোলনে যুক্ত থেকেছেন, তিনি তাঁর 'স্মৃতিচারণ' করতে গিয়ে লিখেছেন—

একাদশীর দিন সেই কচি মেয়েকে নির্জলা উপবাস করতে হয়েছে। আমাদের কৈশোরেও বিধবাদের অসীম দুঃখ ছিল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে তৃষ্ণায় অস্থির বালিকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন আমি শুনেছি। এক ফোঁটা জলের জন্য সে ছুটোছুটি করছে আর কাকুতি মিনতি জানাচ্ছে। তবুও কেউ তাকে একটু তৃষ্ণার জল দিচ্ছে না। আশ্চর্য ও ব্যথিত হয়ে ভেবেছি এমন পাষণ্ড মানুষ কি করে হয়। বাড়ীর লোকেরা ঐ বিধবা বালিকার অতি নিকটতম স্বজন।

এই প্রসঙ্গে তিনি একটি অভিজ্ঞতার কথা লেখেন—

দানাপুরে দুঃখিনী এক বৃদ্ধা মহিলার দেখা পাই, সেখানে তিনি জামাইয়ের আশ্রয়ে ছিলেন, ...নিজের দুঃখের ইতিহাস আমাকে বলে হাল্কা করতে চাইতেন। জামাই এবং দুই নাতি তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না। উনি সারাদিন ওদের সেবা করতেন, রেঁধে বেড়ে খাওয়াতেন। খাবার সময় সম্মুখে বসে পাখার বাতাস করতেন। ওরা মুখটি বুজে আহার পর্ব শেষ করে উঠে চলে যেত ওনার সঙ্গে কোন কথা বলত না। ওদের এই নীরবতায় উনি হাঁফিয়ে উঠতেন নিজে থেকে অনেক কথা বলতেন। ওরা ২/১টা উত্তর দিত। নিতান্ত অবাঞ্ছিতের মতো জামাই বাড়ীতে থাকতে তাঁর ভালো লাগত না।

তারপর একদিন সেই দুঃখী মহিলা তাঁর অতীত জীবন উন্মোচন করেন স্নেহলতার কাছে। ধনী ঘরের মেয়ে ধনী ঘরের বউ হয়ে গিয়েছিলেন দশ বছর বয়সে। তারপর এক ছেলে ও এক মেয়ে হয়, আদরে দিন কাটত। স্বামী ছিলেন রাজার এস্টেটের দেওয়ান, স্বামী কম বয়সে মারা যেতে হয়ে গেলেন বাড়ির রাঁধুনি। স্বামী নিজের নামে কোন সম্পত্তি করেননি। তারপর এল পুত্রের মৃত্যু। কন্যাকে দশ বছর বয়সে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে গরিব ঘরের এক ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন তাঁর শ্বশুরমশাই। তারপর দুটি ছেলে রেখে ভুগে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল মেয়েটিও। তিনি সৎভাইদের চিঠি লিখলেন দশ টাকা খোরাকি বাবদ পাঠানোর জন্য, তিনি কাশী থাকবেন। ভাইরা তাদের কাছে যেতে বলেছিল কিন্তু তিনি তা না করে কাশী গিয়ে ঘরভাড়া নিয়েছিলেন কিছুদিন। ভাইরা তাঁকে নিয়মিত কুড়ি টাকা করে পাঠাত এবং তাতেই তাঁর অস্তিত্ব টিকে ছিল। এই হচ্ছে সমাজে বিধবাদের সাদর অবস্থান।

আর একটি প্রসঙ্গ হল 'বিবাহ' জীবনের মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং 'একটি কর্তব্য'। সেই কর্তব্যপালন একমাত্র পুরুষরাই করবে স্ত্রীরা নয়, সুতরাং—

বাবা বললে শুষ্ক হাসে,
কঠিন আমি কেই বা জানে নাসে?
আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম
স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়
মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।
সহজ তো নয় ধর্মপথে হাঁটা,
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা,
যে করে ভয় দুঃখ নিতে দুঃখ দিতে
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে।"

বাল্যবিবাহ বিরোধিতা!

বিবেকানন্দের বাল্যবিবাহ সম্পর্কে অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। তিনি বলেন—

> বাল্যবিবাহের প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা, ও থেকে আমি প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করেছি, এ একটা মস্ত পাপ যার জন্য আমাদের জাতির অত কষ্ট সইতে হয়। এমতাবস্থায় এরকম একটা নারকীয় প্রথাকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করলে আমার নিজের প্রতিই ঘৃণা জন্মাবে।

তিনি এখানে বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনায় ভাবিত—

> ৮ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বৎসরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা-বাপ, আহ্লাদে আটখানা। ...আবার ও কাজে মানা করলে বলেন, আমাদের ধর্ম যায়! ৮ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন দেশী ধর্ম?

আবার মৃণালিনী বসুকে ১৯০০ সালে লিখলেন,

> আহা!! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত, এমন রীতি কি আর হয়!!! আহা বাল্যবিবাহ কি মধুর!! সে স্ত্রীপুরুষে ভালবাসা না হয়ে কি যায়!!!

অন্যদিকে ১৮৯৫ সালে স্বামী সারদানন্দকে লেখা—

> বাল্যবিবাহের এই নারকীয় প্রথার প্রতি যথাশক্তি পদাঘাত করব।

তিনি বাল্যবিবাহ সম্পর্কে যে পরস্পরবিরোধী মত পোষণ করতেন তা পরিষ্কার হয়ে যায়, আর তাঁর এই দোদুল্যমানতা বহু বিষয়েই আমরা লক্ষ্য করি।

বাল্যবিবাহের সমর্থক!

তিনি বলছেন—

> হিন্দুরা জাতির অবিমিশ্রতা বজায় রাখতে বাল্য-বিবাহ প্রথা গ্রহণ করেছে, সে প্রথা শেষ পর্যন্ত জাতির অধঃপতন ঘটিয়েছে। অথচ আমি অস্বীকার করতে পারি না যে, এই বাল-বিবাহ জাতিকে আরো বিশুদ্ধ করেছে। তোমরা কোনটা গ্রহণ করবে? যদি জাতিকে আরো বিশুদ্ধ করতে চাও তাহলে নারী পুরুষের স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে যাবে। অন্যদিকে ইংলন্ডে কি তোমরা ভাল আছো! না, কারণ বিশুদ্ধতা জাতির প্রাণ। ইতিহাসে কি দেখিনি? কোন জাতির অবিশুদ্ধতাই হল তার মৃত্যুর লক্ষণ! এই ঘটনা ঘটলে, ঐ জাতির ধ্বংস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাহলে এসব দুঃখের সমাধান আমরা কোথায় পাব? যদি বাবা-মা সন্তানদের জন্য স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন করে, তাহলে এই ত্রুটি কমে যায়। ভারতবর্ষের মেয়েরা যতটা ভাবপ্রবণ, তার চেয়ে বেশি বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন। কিন্তু তাদের জীবনে কবিত্বের স্থান খুব সংকীর্ণ। আবার লোকেরা যদি নিজেরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন করে, তাহলে তাতে খুব সুখ হবে বলে মনে হয় না। ভারতীয় স্ত্রীলোক সাধারণত খুব সুখী; স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার ঘটনা বেশি ঘটে না। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা পাওয়া যায়, সেখানে অসুখী সংসার ও অসুখী বিবাহের সংখ্যা প্রচুর। দুঃখ এখানে সেখানে সর্বত্র রয়েছে। তাতে কি প্রমাণ হয়? এই সব আদর্শে অন্তত বেশি সুখলাভ করা যায় নি। আমরা সকলে সুখের জন্য সংগ্রাম করছি, একদিকে একটু সুখ পেলেই অন্যদিকে দুঃখ দেখা দেয়।

অর্থাৎ পক্ষান্তরে তিনি আবার বাল্য-বিবাহকে সমর্থন করছেন, তিনি বলেছেন , ''বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সঙ্গে ঘোষণা করছে : নিজেকে বিশুদ্ধ রাখুন।'' এই বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তিনি বাল্যবিবাহ চেয়েছেন, আবার এও বলেছেন তাতে ''নারী পুরুষের স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে যাবে''। তাহলেও তো জাতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। তিনি অবিরত পরস্পরবিরোধী কথা বলে গেছেন। তিনি আরো বলেছেন ভারতীয় নারীরা সুখী, তিনি এই তথ্য কোথা থেকে পেলেন? তিনি যাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন, তাঁর মাতা সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট বলেছেন তিনি সারাজীবন দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন আর তিনি যে বলেছেন ভারতীয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াবিবাদ খুব একটা ঘটে না, তা সত্য হতে পারে কিন্তু তা সুখের কারণে নয়— তারা সর্বংসহা বলে, মুখ দেড় হাত ঘোমটায় ঢাকা দিয়ে, কথা বললেও নিম্নস্বরে আর বিবাদ করে কোথাও গিয়ে আশ্রয় জুটবে না জেনে মুখ বুঝে থাকতে হয়েছে চোখের জলকে সঙ্গী করে।

জীবন রসিক বিবেকানন্দ

এবার অন্য একটি প্রসঙ্গে আসি। বিবেকানন্দ লিখছেন—

> পাশ্চাত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্নহার্ড আর সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা কালভে দুজনেই ফরাসী, দুজনেই ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, কিন্তু ইংলন্ড ও আমেরিকায় মধ্যে মধ্যে যান ও অভিনয় আর গীত গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেন। ফরাসী ভাষা সভ্যতার ভাষা— পাশ্চাত্য জগতের ভদ্রলোকের চিহ্ন— সকলেই জানে; কাজেই এদের ইংরাজি শেখবার অবকাশ ও প্রবৃত্তি নাই।
>
> মাদাম বার্নহার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন, তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল! বালিকা-বালক যা বল তাই— হুবহু। আর সে আশ্চর্য আওয়াজ বিশেষ ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারবার বলেন, তোমাদের দেশ 'ত্রেজাঁসিত্রন,', 'ত্রেসিভিলিজে'— অতি প্রাচীন অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত এক নাটকে অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষ!!

মাদমোয়াজেল কালভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন— ইজিপ্ট প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি এঁর অতিথি হয়ে, কালভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন তা নয়, বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়; ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে বহু কষ্ট করে এখন প্রভূত ধন। — রাজা-বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম মেলবা, মাদাম এমা এমস্ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকা সকল আছেন, জ্যাঁদ্য রেজকি, প্লাঁসঁ প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়ক সকল আছেন, এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন! কিন্তু কালভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় প্রতিভা, অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা আর দৈবী কণ্ঠ এসব একত্র সংযোগে কালভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে।

এই বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নয়, তাঁর ভিন্নতর রূপ এখানে প্রস্ফুটিত। ইনি জীবনরসিক— নাচগান, অপেরা, নাটকের রসগ্রহণ করছেন, শিল্পীদের গুণে মুগ্ধ হচ্ছেন। যে কালভের বিশ্ববিখ্যাত উক্তি আমরা জানি— 'যে শরীরের জন্য আমরা এত কষ্ট পাই, সেই শরীর থেকে যদি আনন্দ লাভ করতে পারি তবে তা গ্রহণ করব না কেন?' —কালভে বলেছিলেন তাঁর বহু পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়া প্রসঙ্গে। সেই কালভের অতিথি হয়ে যাচ্ছেন বিবেকানন্দ; কতখানি ছুৎমার্গহীন এবং প্রশস্ত হৃদয় হলে এমন সম্ভব হয়!

উন্নত মানবতাবোধ

তিনি বলছেন—

রাস্তার দুশ্চরিত্রা নারীকে দেখে আমায় ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করতে হয়, কারণ সমাজ তাই চায়। সে আমার ত্রাণকর্ত্রী, তার পতিতাবৃত্তি অন্য নারীদের সতীত্ব রক্ষার কারণ।

একই সাথে তিনি পরস্পরবিরোধী কথা বলছেন। নিউ ইয়র্কের বক্তৃতায় বলছেন—

যে সব অসহায় নরনারী ভুল করেছে তখন আর তাদের দিকে তাচ্ছিল্যের চোখে তাকাবে না। ভদ্রমহিলাগণ! তোমরা তখন রাত্রে কোন অসহায় স্ত্রীলোককে রাস্তায় ঘুরতে দেখলে ঘৃণার চোখে তাকাবে না কারণ সেখানেও তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখবে। তখন আর ঈর্ষা বা শাস্তির কথা ভাববে না। সে সব চলে যাবে; ভালবাসা বা ভালবাসার মহৎ আদর্শ এত প্রবল হয়ে উঠবে যে মানবজাতিকে সঠিক পথে চালাবার জন্য কোন শাসনের প্রয়োজন হবে না।

এমন সমাজ সকলেরই কাম্য। যেখানে জেলখানা থাকবে না, পুলিশ থাকবে না। এবিষয়ে তাঁর আর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি—

যখন আমার বয়স বিশ বছর তখন ছিলাম আপসহীন, সহানুভূতিহীন এক অন্ধ ফ্যানাটিক। কলকাতার রাস্তায় যেদিকে থিয়েটার আছে সেদিক দিয়েই হাঁটতাম না। আজ তেত্রিশ বছর বয়সে আমি বারবণিতাদের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করতে পারি, আর তাদের নিন্দায় একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে না।

তাঁর এই উত্তরণ মানব প্রগতির পক্ষে।

আদর্শ নারী সীতা

অন্য একটি বক্তৃতায় বলছেন—

পৃথিবীর অতীতে সমস্ত সাহিত্য খুঁজে দেখুন, এমনকি আমি জোর গলায় বলতে পারি আগামী দিনের সাহিত্য সমস্ত পড়ে শেষ করেও আর একটি সীতা খুঁজে পাবেন না। সীতা অনন্যা, সে চরিত্র একবার এবং ঐ শেষবারের মত বর্ণিত হয়েছিল। অনেক রামের দেখা হয়ত পাওয়া যেত, কিন্তু সীতা একজনের অধিক ছিল না। তিনি হলেন ভারতীয় নারীর আদর্শ রূপ, কারণ বিশুদ্ধ রমণী সম্পর্কে যে ভারতীয় আদর্শগুলি আছে তা সবই গড়ে উঠেছে ঐ এক সীতার জীবনীকে কেন্দ্র করে। হাজার বছর ধরে তিনি আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন, আর্যাবর্তের সমস্ত অঞ্চলের প্রতিটি নর-নারী শিশুর তিনি পূজনীয়া।

ঐ শ্রদ্ধার আসনেই চিরদিন আসীন থাকবেন, আমাদের মহীয়সী সীতা, ...পবিত্র, ধৈর্য ও সহনশীলতার উজ্জ্বল নিদর্শন। যে সীতা তাঁর দুঃখভরা জীবন নীরবে সহ্য করেছেন, যিনি চিরপবিত্রা সহধর্মিনী, দেবতাদের আদর্শ, মানুষের আদর্শ, সেই মহীয়সী সীতা আমাদের জাতীয় দেবী, সকল সময়েই আমাদের মধ্যে থাকবেন। ...আমাদের সমস্ত পুরাণ লোপ পেতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পাঁচজন হিন্দু এদেশে থাকবে, তারা সবচেয়ে অমার্জিত প্রাদেশিক ভাষায় কথা বললেও সীতার কাহিনী তার মধ্যে থাকবে। ...সীতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে আমাদের নারীদের আধুনিকা করার যে কোন প্রয়াস সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ হয়, আমরা তা প্রত্যহ দেখি। ভারতবর্ষে নারীরা সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই গড়ে উঠবেন, এবং এটিই একমাত্র পথ।

এছাড়া পিতৃতান্ত্রিক ভাবনা আর কিই বা হতে পারে? নারী সব সহ্য করবে, প্রতিবাদ করবে না, এমনটাই তো সমাজের কাম্য হয়ে এসেছে, তিনি তার বাইরে যাননি এবং 'আমাদের নারীদের আধুনিকা করার যে কোন প্রয়াস সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ হয়'— এই মন্তব্য যে ভ্রান্ত আজকের সমাজ তার সাক্ষী। স্ত্রীলোক 'নারী' নয় মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে সব মুখ বুঝে সহ্য না করে— এই কাম্য পথেই ভারতীয় নারী এগিয়ে চলেছে বিবেকানন্দের বাণী ভ্রান্ত প্রমাণ করে।

সতীদাহর সমর্থক

সালেম ইভনিং নিউজ এবং *ডেলি গেজেট* পত্রিকা ২৯শে আগস্ট ১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে লেখে—

> ভারতে স্ত্রীজাতির অনুন্নত অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করে বক্তা বলেন যে, হিন্দুদের নারীজাতির প্রতি এতই শ্রদ্ধা যে তারা নারীকে ঘরের বাইরে না যেতে দেওয়াই সমীচীন মনে করে। হিন্দু নারী এতই উচ্চাসনে আসীন যে তারা সাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সহমরণের পুরনো প্রথার ব্যাখ্যা করে বক্তা বলেন যে, স্ত্রী স্বামীকে এত ভালবাসতেন যে তাঁকে ছাড়া বাঁচা অসম্ভব মনে করতেন। বিবাহে তাঁরা এক হয়েছিলেন মৃত্যুতেও তাঁদের এক হওয়া উচিত।

পুরনো যুগে হিন্দুরা কি তাদের পিতা, পিতামহকে শ্রদ্ধা করত না? না হলে তো তাদেরও ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া উচিত হত না। আর স্বামী-স্ত্রী বিবাহে এক হয়েছিলেন, স্ত্রী মারা গেলে পতি তখন সহমরণে গিয়ে কেন এক হত না? ভালবাসা কি একতরফা ছিল? শুধু স্ত্রীই ভালবাসত?

পিতৃতান্ত্রিক ভাবনা

তিনি আরো বলেছেন—

> স্ত্রী-সম্বন্ধীয় আচার পৃথিবীর সর্বদেশেই এক রূপ, অর্থাৎ পুরুষ মানুষের অন্য স্ত্রীসংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাটায় মুশকিল। তবে ফরাসী পুরুষ একটু খোলা, অন্য দেশের ধনী লোকেরা যেমন এ সম্বন্ধে বেপরোয়া তেমনি। আর ইউরোপীয় পুরুষ-সাধারণ ও বিষয়টা তত দোষের ভাবে না। অবিবাহিতের ও বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বড় দোষের নয়; বরং বিদ্যার্থী যুবক ওবিষয়ে একান্ত বিরত থাকলে অনেক স্থলে তার বাপ-মা দোষাবহ বিবেচনা করে, পাছে ছেলেটা 'মেনিমুখো' হয়। ...মেয়েমানুষের পক্ষে সতীত্ব অত্যাবশ্যক বটে।

এরপর তিনি বলেছেন—

> স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ হলে ছেলেপিলে জন্মায় না এবং সমগ্র জাতির ধ্বংস। পুরুষ-মানষে দশ গণ্ডা বে করলে তত ক্ষতি নাই বরং বংশ-বৃদ্ধি খুব হয়। স্ত্রীলোকের একটা ছাড়া আর একটা এক সঙ্গে চলে না— ফল বন্ধ্যাত্ব। কাজেই সকল দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের ওপর বিশেষ আগ্রহ...।

সমাজে যে পিতৃতান্ত্রিক ভাবনা প্রচলিত তারই প্রতিধ্বনি, সঙ্গে গাঁজাখুরি গল্প বন্ধ্যাত্বের!

এরপর একস্থানে তিনি বলেছেন—

> পুরুষ অথবা স্ত্রীর প্রধান গুণ হল পবিত্রতা, যত পতিতই হোক, তবু শান্ত, স্নেহশীলা, সতী স্ত্রীর চেষ্টায় সৎপথে আসে না, এমন পুরুষ অতি বিরল। পৃথিবী এখনো তত খারাপ হয়নি। সারা পৃথিবীতে বর্বর স্বামী ও অধঃপতিত পুরুষের কথা অনেক শুনি কিন্তু অত সংখ্যক বর্বর ও পতিতা রমণীও কি নেই? যদি সব স্ত্রীলোক যেমন দাবি করে, তেমন সৎ পবিত্র হত, তাহলে জগতে একটিও অসৎপুরুষ থাকত না। এমন কোন পশুত্ব আছে যা পবিত্রতার কাছে পরাভূত হয় না? যে সতী স্ত্রী নিজের স্বামী ছাড়া অন্য সব পুরুষকে সন্তানের মত দেখে এবং সকলের সঙ্গে মায়ের মত ব্যবহার করে, তার পবিত্রতা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, কোন লোক যত পশুই হোক, তার উপস্থিতিতে পবিত্রতা অনুভব করবে।

আমরা পরবর্তীকালে এই 'পবিত্রতা'র বাতিক দেখেছি গান্ধীর মধ্যে। আর উপরি-উক্ত মন্তব্যে স্ত্রীলোকের উপর সব দায় চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়াশীল এবং পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা দেখতে পাই।

বিবেকানন্দ অন্যত্র বলছেন—

> আমি একজন মহিলাকে জানি যাঁর স্বামী একজন নামকরা মদ্যপ। সেই মহিলা তাঁর স্বামী সম্পর্কে আমার কাছে অভিযোগ করতেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম "মহাশয়া, যদি আপনার মতন ২ কোটি স্ত্রী থাকে, তাহলে সকল স্বামীই মাতাল হবে"। একটা বিষয় আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি যে অধিকাংশ স্বামীই তাদের স্ত্রীদের জন্য মাতাল হয়। আমার কাজ হল সত্যি কথা বলা, কাউকে তোষামোদ করা নয়।
>
> এই ধরনের অবাধ্য মহিলাদের মন থেকে সহিষ্ণুতা ও কোমলতা এই কথা দুটি সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত। স্বাধীনতা সম্পর্কে মিথ্যা ধারণার দরুনই তারা ভাবতে পারে যে স্বামীরা তাদের পদানত। তাদের শুনতে ভাল লাগে না এমন কথা বললেই তারা গর্জন করে ওঠে। এই ধরনের মহিলারাই সংসারে সর্বনাশের কারণ।

নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

আবার এই বিবেকানন্দই একস্থানে বলছেন—

> স্ত্রীকে তিরস্কার করবে না, মায়ের মত পালন করবে। চরম বিপদেও তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবে না।
>
> যে পরস্ত্রীর চিন্তা করে, এমনকি শুধু মনে মনে তাকে স্পর্শ করলেও— নরকে যায়।
>
> মেয়েদের সামনে অশোভন ভাষায় কথা বলবে না, নিজের ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করবে না, বলবে না, "আমি এই করেছি। ঐ করেছি।"
>
> গৃহস্থ সর্বদা স্ত্রীকে অর্থ, বস্ত্র, প্রেম, বিশ্বাস ও অমৃতময় ভাষায় তুষ্ট করবে, কখনো তার বিরক্তি ঘটাবে না। যে পুরুষ সতী স্ত্রীর ভালবাসা পেয়েছে সে ধর্ম ও অন্য সব সদ্‌গুণে সফল হয়েছে।

পরস্পরবিরোধী মন্তব্য।

নারীকে নিকৃষ্ট ভাবা

এরপর অন্য একটি প্রসঙ্গে আসি—

ভদ্রমহিলাগণ আমায় ক্ষমা করবেন, বহু শতাব্দীর দাসত্বের ফলে আমরা যেন এক স্ত্রীলোকের জাতিতে পরিণত হয়েছি। এদেশে বা অন্য দেশে যে কোন দেশে দেখবে— তিনজন স্ত্রীলোক যদি পাঁচমিনিটের জন্য একত্র হয় তো তারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করবে। ইউরোপীয় দেশগুলিতে মেয়েরা বড় বড় সমিতি গড়ে নারী জাতির ক্ষমতা ও অধিকার বড় গলায় জাহির করে আর তারপর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দেয়, তখন কোন পুরুষ এসে তাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করতে থাকে। সারা জগতে নারী জাতির এখনও পুরুষের প্রয়োজন হয় তাদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য। আমরা এমনিধারা স্ত্রীলোক হয়ে গেছি। যদি কোন নারী এসে নারীজাতির নেতৃত্ব করতে যায়, অমনি সকলে মিলে তার সমালোচনা শুরু করে দেয়। তাকে ছিঁড়ে ফেলে, দাঁড়াতে দেয় না। যদি একজন পুরুষ এসে তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে, মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করে তবে তারা মনে করে ঠিক হয়েছে। তারা এরকম বশীভূত থাকতেই অভ্যস্ত।

নারীকে পদানত রাখতে হলে এই ধরনের প্রচার সমাজের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। যে কোন সাধারণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত পুরুষ এমন মন্তব্য করতেই অভ্যস্ত এবং তার সাথে নারীর মনেও শুনে শুনে এই ভাবনা গেঁথে গেছে। তারাও তাই ভাবে ও বলে, এবং পুরুষের কাছেও হীনমন্যতায় ভোগে। প্রায়শই শোনা যায় একটি কথা, 'মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু'। তথাস্তু! কিন্তু 'পুরুষও তো পুরুষের শত্রু'। সে কথা কেন শোনা যায় না? পুরুষরা কি সবাই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু? যত যুদ্ধ, হাঙ্গামা, খুন, আগ্রাসন সবই তো (প্রধানত) পুরুষ কর্তৃক, আর এতে মরেও তো বেশি পুরুষ! তবে কেন এই শব্দবন্ধ উচ্চারিত হয় না? কারণ পুরুষের নয়, নারীর মনে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে তাকে অবদমিত রাখায় এটি সহায়ক।

সিংহলে বৌদ্ধদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

...ওরা নিজের দেশকে বলে সিংহল। লঙ্কা বলে না বলবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো— ঘাঘরা পরা, খোঁপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানি চিরুণী দেওয়া মেয়েমানষি চেহারা! আবার রোগা-রোগা, বেঁটে বেঁটে, নরম-নরম শরীর! এরা রাবণ-কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি! বলে— বাঙলা দেশ থেকে এসেছিল— তা ভালই করেছিল, ঐ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমানষের মত বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন— ওরা যাক না বাপু সিলোনে। ...গাড়ী গাড়ী মেয়ে দেখলাম, সব ঐ ঢঙের শাড়ী পরা।

স্পষ্টত তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে নারী সম্পর্কে এবং শেষ কথা হল গাড়ী বোঝাই চাল-ডাল বা কয়লার মত মেয়েও বস্তু— গাড়ী গাড়ী বোঝাই হয়ে চালান হয়।

তিনি অন্যত্র বলছেন—

আমি দেখেছি যে পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে সব দেশেই বোঝবার আর বিচার করবার রাস্তা আলাদা। পুরুষ একদিক দিয়ে বুঝবে, মেয়েমানুষ আর একদিক দিয়ে বুঝবে; পুরুষের যুক্তি একরকম মেয়েমানুষ আর এক রকম। পুরুষ মেয়েকে মাফ করে, আর পুরুষের ঘাড়ে দোষ দেয়; মেয়েতে পুরুষকে মাফ করে, আর সব দোষ মেয়ের ঘাড়ে দেয়।

চিরন্তন সত্য। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

নারীমুক্তির সমর্থক

এক সময় বলেছেন—

আমেরিকা গ্রান্ড দেশ, নারীদের পক্ষে এবং দরিদ্রদের পক্ষে এদেশ স্বর্গ বিশেষ। এদেশে দরিদ্র প্রায় নেই বললেই হয়; আর নারী বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও এমন স্বাধীন, এমন শিক্ষিত এবং সংস্কৃতি সম্পন্ন নেই, সমাজে এঁরাই সব।

এই তথ্য সম্পর্কে আমাদের বলার কিছু নেই, কিন্তু নারীকে শিক্ষিত, স্বাধীন, সচেতন দেখে তিনি উৎফুল্ল হয়েছেন এবং নির্দ্বিধায় বলেছেন এমন অবস্থাই কাম্য— তাঁর এই জীবনবোধ আমাদের আশান্বিত করেছে।

১৮৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে মিস বেল্‌কে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ—

আপনার জানা আছে এই ব্রুকলিন হল নারী-অধিকার বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র। আমি যখন বললাম সব কিছুতেই নারীর অধিকার আছে এবং সে অধিকার লাভে তারা যোগ্য তখন এখানকার লোকের সে কথা নিশ্চয়ই ভালো লাগবার নয়। আক্ষেপের কিছু নেই মেয়েরা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন।

এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের প্রফুল্ল করে।

নারীমুক্তির পক্ষে

তিনি একটি সর্বজনীন সত্য কথা বলেছেন নারী সম্পর্কে—

এমন কোন মা হয়নি যে তার ছেলেকে জাত প্রতিভা মনে করেনি, তার ছেলে সবচেয়ে আশ্চর্য ছেলে; সে সন্তানকে নিয়ে অস্থির। তার সমগ্র মনপ্রাণ রয়েছে সন্তানে।''

বিবেকানন্দ নারী বিষয়ে নানারকম মন্তব্য করেছেন, তার মধ্যে

এর পর ৪০ পৃষ্ঠায়

শতবর্ষে স্মরণ

সরোজ দত্ত স্মরণে

সমরেশ মিত্র

অতিবামপন্থী বিচ্যুতির যুগে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল, সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষক-পেটিবুর্জোয়া ছিল, ছিল শ্রেণীসংগ্রাম, ছিল বীরত্ব ও আত্মত্যাগ। অতএব শিল্প-সাহিত্যে তার প্রতিফলন, কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই বলিষ্ঠ বিপ্লবী ঐতিহ্য। অতিবাম বিচ্যুতির ও হঠকারিতার বিরুদ্ধে লড়াই-এর নামে যারা এই ঐতিহ্যকে মুছে দিতে চায়, তারা মতলববাজ, কারণ এই মওকায় আবার তারা শোধনবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

—সরোজ কুমার দত্ত, 'বাংলার পার্টি প্রভাবিত শিল্প-সাহিত্য শোধনবাদীদের ভূমিকা', *শারদীয়া দেশহিতৈষী*, ১৯৬৫

শহিদ প্রফুল্ল চাকীর মুণ্ডটি তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলকাতা পুলিশের একজন অফিসার ১৯০৮ সালে বিহারের মোকামা থেকে কলকাতায় আনে। পরে সেটিকে সংরক্ষণের জন্য কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে জমা রাখা হয়। এই ঘটনার প্রায় ৬৩ বছর পর বামপন্থী কমিউনিস্ট সাহিত্যিক-রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা সরোজ কুমার দত্ত-র মুণ্ডটি তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় স্বাধীন ভারতের কলকাতা পুলিশ, কলকাতা ময়দানের এক অজ্ঞাত স্থানে, ৪-৫ অগস্ট ১৯৭১-এর ব্রাহ্মমুহূর্তে। শহিদ প্রফুল্ল চাকীকে হত্যা করে পুলিশ গুজব ছড়িয়েছিল যে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন (যার কোনও প্রমাণ মেলেনি)। আর সরোজ দত্ত-র ক্ষেত্রে পুলিসের বয়ান যে তিনি আজও নিখোঁজ। হয়তো এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোনও এক গবেষক শহিদ সরোজ দত্ত-র কাটা মাথাটি পুলিশের মহাফেজখানা থেকে উদ্ধার করবেন। সত্তরের দশকে বধ্যভূমি হয়ে ওঠা এই দেশের ঘটমান-বর্তমান নিয়ে শিল্প-সাহিত্যের মুরুব্বিবৃন্দ যে বৈদান্তিক নির্লিপ্তি প্রদর্শন করেছিলেন, বিপ্লবী কবি-সাহিত্যিক সরোজ দত্ত ছিলেন তার বিরুদ্ধে এক সংহত প্রতিবাদের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

১৯১৪ সালে ১৩ মার্চ অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায় সরোজ কুমার দত্ত-র জন্ম হয়। তাঁর বেড়ে ওঠার সময়টাই ছিল বিদ্রোহ আর বিপ্লবে সম্পৃক্ত। তাই ২৮ বছরের দুরন্ত যুবক সরোজের অনিবার্য যাত্রাপথ ছিল কমিউনিস্ট-প্রভাবিত পত্রিকা *অগ্রণী*, *অরণি*-র দিকে।

ইংরাজি সাহিত্যের মগ্ন পাঠক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী সরোজ অমৃতবাজার পত্রিকা-র সহ-সম্পাদকের পদে যোগ দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। কবি এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে এই সময় তিনি পরিচিত লাভ করেন। মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে তাঁর দুটি প্রবন্ধ, 'ছিন্ন করো ছদ্মবেশ' এবং 'আধুনিক বাংলা কবিতা' বাঙালি পাঠকদের আলোড়ন তোলার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য আলোচনার জগতে এক নতুন ধারার জন্ম দেয়।

কবিতা ও প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি অনবদ্য অনুবাদও চলতে থাকে। রোঁম্যা রঁল্যা-র 'I will not rest' -এর সার্থক অনুবাদ করেন সরোজ দত্ত। নাম দেন 'শিল্পীর নবজন্ম'। তখন কে-ই বা জানত যে তিনি আসলে তাঁর পরিণত বয়সের চলার পথের এক ইঙ্গিত রেখে গেলেন! তাঁর অনুবাদেই বাঙালি পাঠক ক্রুপস্কায়া রচিত লেনিনের জীবনী পড়েছেন।

তৎকালীন 'যুগান্তর' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র বকলম মালিকানা একই থাকলেও ঐ পত্রিকার কর্মীদের দুটি আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ছিল, যার সদস্যপদ সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র প্রেসকর্মীদের মধ্যেই। সরোজ দত্ত-র প্রভাবে এই দুই পত্রিকার কয়েকজন সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে এই দুই ইউনিয়নে যোগ দিয়ে এক ব্যতিক্রমী আদর্শ স্থাপন করেন।

১৯৪৬-এর উত্তাল সময়ে নানা দাবি নিয়ে এই দুই ইউনিয়ন ধর্মঘটে সামিল হলে সাংবাদিক সরোজ দত্ত শ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধর্মঘটে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই ধর্মঘট শত চেষ্টা করেও ভাঙা যায়নি। কিন্তু মালিকপক্ষ প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় থাকে।

মালয় এবং অন্যান্য এশিয়ার দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছিল, কাগজের মালিক সেই মুক্তিযোদ্ধাদের 'ডাকাত' বলে লিখতে বলায় সরোজ দত্ত সহ আরও অনেক সাংবাদিক তা লিখতে অস্বীকার করেন। ১৯৪৭-এ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভার কালে পত্রিকার মালিক মজুরি কমিয়ে শ্রমিক এবং সাংবাদিকদের 'বেয়াদপি' দমনের জন্য ৬ জন কর্মীকে ছাঁটাই করে। সাংবাদিক সরোজ দত্ত-ও রাজনৈতিক কারণে ছাঁটায়ের শিকার হন। এরপর সরোজ দত্ত আর পাকা চাকরির কথা না ভেবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কমিউনিস্ট পার্টির কাজে তিনি যত বেশি বেশি করে জড়িয়ে পড়তে থাকেন, ততই তাঁর প্রতি রাজরোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় এবং তিনি অন্তরালের জীবন বেছে নেন। এর মধ্যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মাসিক *পরিচয়* পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও সামলেছেন।

কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *স্বাধীনতা*-য় যোগ দেন সরোজ দত্ত। কমিউনিস্ট পার্টিতে তখন মতাদর্শগত বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সোভিয়েত পার্টির বিংশতি কংগ্রেস, শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, ব্যক্তিপূজা এবং নিঃস্তালিনীকরণের প্রশ্নে

বিশ্বব্যাপী বিতর্কে ভারতের কমিউনিস্টরাও সামিল হয়েছেন।

১৯৬২-এর ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ ঘিরে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে চলমান মতাদর্শগত বিতর্ক ভাঙনের চেহারা নিয়ে হাজির হয়। ভারত সরকার বেছে বেছে চীনের সমর্থক কমিউনিস্টদের বন্দি করে। সরোজ দত্ত-ও পুলিশের চোখে বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ১৯৬৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাবেকি অংশটি ত্যাগ করে নবীন অংশ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-মার্কসবাদীতে যোগ দেন এবং এই পার্টির মুখপত্র *দেশহিতৈষী*-তে নিয়মিত লিখতে থাকেন। ১৯৬৫-৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের সময় তাঁর কলম আন্দোলনকারীদের পক্ষ নেয়।

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মোহিত মৈত্র সহ আরও কিছু পরিচিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী একত্রে একটি রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবেন। সরোজ দত্ত সেই পত্রিকার নামকরণ করেন *কালপুরুষ*। প্রথম প্রকাশেই *কালপুরুষ* বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতে সাড়া জাগায়। ১৯৬৪ তৈরি হওয়া নতুন কমিউনিস্ট পার্টিতে মতাদর্শগত সংগ্রামের জন্য অনেক অন্তর্দলীয় গোষ্ঠী ছিল। সরোজ দত্ত এমন একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গের তরাই-এর অখ্যাত গ্রাম নকশালবাড়ির একটি জোতে বিগল কিষাণের আইনমাফিক ভাগচাষীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে রক্তাক্ত হলে *কালপুরুষ* পত্রিকা কৃষকদের সমর্থনে কলম ধরে। সিপিআই(এম)-এর সাংস্কৃতিক মাসিক *নন্দন* পত্রিকাও নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামকে সমর্থন করে। সিপিআই(এম) সরোজ দত্ত সহ আরও অনেক প্রথম সারির নেতাকে পার্টি-বিরোধী কাজের জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কার করে। এই বহিষ্কারের ঢেউ পরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

এই সমস্ত বহিষ্কৃত নেতা-কর্মীরা (এবং আরো অনেকে)মিলিত হয়ে কলকাতায় সারা ভারত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি গঠন করেন। এই সমন্বয় গঠন এবং তৎপরবর্তী সময়ে সরোজ দত্ত-র নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা ছিল। এই সমন্বয়ের বাংলা সাপ্তাহিক *দেশব্রতী* পত্রিকার অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন সরোজ দত্ত।

পরে সিপিআই(এমএল) যখন গঠিত হয়, তখন সরোজ দত্ত এই পার্টির নেতৃত্বে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত পুনরায় অন্তরালের জীবন বেছে নেন। 'শশাঙ্ক' ছদ্মনামে তিনি যে রাজনৈতিক ভাষ্য লিখতেন 'দেশহিতৈষী'-তে সেই ভাষ্যকারের কাজ একই ছদ্মনামে 'দেশব্রতী'-র পাতায় পত্রস্থ করা শুরু করেন। সিপিআই(এমএল)-এর অন্যান্য অনেক নেতার মতো সরোজ দত্ত-র ওপরও দাম ধার্য করা হয়েছিল। সেই কঠিন সময়েও তিনি অন্তরালে থেকে পার্টির রাজনৈতিক কাজের পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা অব্যাহত রেখেছেন।

১৯৭১ সালের অগস্ট মাসে দক্ষিণ কলকাতার একটি আশ্রয়স্থল থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে, যদিও আজ পর্যন্ত পুলিশ এই গ্রেপ্তারের কথা স্বীকার করেনি। নকশালবাড়ির ঘটনার চার বছর পর স্বাধীন দেশের পুলিশ তাঁর মুণ্ডহীন দেহ সেই ময়দানে ফেলে রেখে যায়। তাঁর বয়স তখন ৫৭ বছর। তাঁর মৃত্যুর পর কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্য লেখেন :

> শেষ রাত্রির ময়দানে সরোজ দত্তের দোমড়ানো শরীর ফেলে গেছে ছিন্নমস্তার বেতনভুক কবন্ধরা— বারুদের গন্ধে গোল ছিদ্র দিয়ে গড়িয়ে-আসা প্রৌঢ় রক্তে খেলা করছে শহীদ মিনার বিধৌত প্রথম রৌদ্র... (*আগামীপক্ষের সওয়াল*)

জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি মেলে আজকে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যে ঝড়ের সন্তান ছিলেন সরোজ দত্ত, উত্তাল গণপ্লাবনের ঢেউ-এর মাথায় চড়ে সমাজ-সংসার নিয়ে যে একরাশ প্রশ্ন তুলে পাড়ি জমিয়েছিলেন মহাসমুদ্রে, আজকের সমাজ বাস্তবতায় সেইসব প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা কতটা! বস্তুত সরোজ দত্তরা কি আজকে আদৌ স্মরণযোগ্য কোনও উত্তরাধিকার? নকশালবাড়ির আন্দোলন পা দিতে চলেছে অর্ধশতক পূর্তিতে। ইতিহাসচর্চার ধারণায় আন্দোলনটি এবং তার সময়কাল সমসাময়িক ইতিহাসের স্তর ছাড়িয়ে প্রকৃত অর্থে ইতিহাস হয়ে ওঠার দাবিদার। সরোজ দত্ত সেই কবে তিরিশের দশকে অবিভক্ত ভারতে প্রশ্ন তুলেছিলেন শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে গণআন্দোলনের সত্যিকারের শরিক হওয়ার 'হিম্মৎ' ধরেন কিনা। এমন সতেজ, তীক্ষ্ম এবং সরাসরি প্রশ্ন তোলা বোধকরি সরোজ দত্ত-রই শোভা পায়। 'আফ্রিকার বুকে একটি সকাল' কবিতার লেখক এই প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় দ্বন্দ্বের নিরসনকল্পে প্রাণ দেন ঘাতকের বুলেটের আঘাতে।

অর্ধশতক আগে সরোজ দত্ত-র তোলা নানা ঐতিহাসিক প্রশ্ন আজও সমান সজীব। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ চরিত্রের দিক থেকে সামন্তবাদ পুনরুত্থানের কাহিনী নাকি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ— 'শশাঙ্ক' ছদ্মনামের অন্তরালে সরোজ দত্তের তোলা বিতর্কে উদ্বুদ্ধ হয়ে এমনকি মান্য পণ্ডিতকুলও ১৮৫৭-র পুনর্মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। ভূমি-বণ্টন, ভূমি-প্রশ্ন যে ভারতীয় সমাজের বন্দিদশা থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক বিষয় তা সামনে এনেছে নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন— যে বিষয়টি সরোজ দত্ত-র লেখা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

'ভারতীয় রেনেসাঁ' নিয়ে যে বিতর্ক ভারতীয় কমিউনিস্টদের সর্বদা তাড়া করে ফিরেছে, ১৯৬৯-এ গঠিত নবীন কমিউনিস্ট পার্টিও সেই বিতর্ক আবার সামনে আনে। সরোজ দত্ত এই রেনেসাঁ সংক্রান্ত যে বিতর্ক পরিচালনা করেন, যা আজকেও বহু-নিন্দিত 'মূর্তিভাঙা-র আন্দোলন' বলে চিত্রিত

এর পর ৩৮ পৃষ্ঠায়

শতবর্ষে স্মরণ

বিপ্লবীর 'বাবু'-দর্শন ও প্রসঙ্গত

অশোক চট্টোপাধ্যায়

সরোজ দত্ত সমর সেনের সহপাঠী ছিলেন, এ তথ্য বাবুবৃত্তান্ত*-এই পাওয়া যায়। দু'জনেই ইংরেজি সাহিত্যের সাম্মানিক বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ছাত্র হিসেবে দু'জনেই কৃতী (যদিও সমর সেনের ঔজ্জ্বল্য একটু বেশি)। ছাত্রজীবনেই 'রাজরোষে' পড়ার দুঃসাহস দেখিয়ে সরোজ দত্ত জেলে গিয়েছিলেন। এরকম দুঃসাহস সমর সেন দেখাতে পারেন নি। জেলের বাইরে এসে সরোজ দত্ত আবার পড়াশুনার কাজে যুক্ত হন এবং এম.এ. পাশ করেন ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। অন্যদিকে সমর সেন সরোজ দত্তের দুঃসাহস অনায়ত্তের দরুণ এম.এ. পাশ করেন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে**। সরোজ দত্তের এক বছর আগে।

দু'জনে প্রায় সমবয়সি। সরোজ দত্ত একটু বড়ো। সমর সেনের জন্ম ১০ অক্টোবর, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে, আর সরোজ দত্তের ১৩ মার্চ, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে।

সমসময়ের রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই উভয়ের তারুণ্য অতিবাহিত হয়েছে। রাজনীতিমনস্কতাকে কেউই পরিহার করেন নি। বরং রাজনীতির ব্যাপারে ছাত্রজীবন থেকেই সরোজ দত্ত অতিমনস্কতার পরিচয় রেখেছিলেন, রাজনীতির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, যৌবনোচিত বিদ্রোহকে অনাবৃত রেখেছিলেন। সমর সেন এতখানি এগোন নি। এগোতে পারেন নি। যে সংশয়ের নিরসন ঘটিয়ে সরোজ দত্ত সরাসরি রাজনীতির পরিক্ষেত্রে ব্রতচর্যায় সামিল হয়েছিলেন, জীবনকে নতুনভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, সে সংশয়ের নিরসন ঘটাতে সমর সেন ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে রাজনীতির সংস্পর্শেই তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে লালন করেছিলেন, সরোজ দত্তের মতো আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সাহস অর্জন করতে পারেন নি।

বুদ্ধিচর্চায় মার্কসবাদকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমর সেন কোনোরকম দ্বিধাচিত্ততাকে প্রশ্রয় দেননি। এহেন বুদ্ধিচর্চাকে মার্কসবাদী রাজনীতির অনুশীলক হিসেবে সরোজ দত্ত প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন নি। এহেন বুদ্ধিচর্চাকে তিনি ভাববিলাসের সমার্থক বলে মনে করতেন। বস্তুতন্ত্রবাদী 'কল্লোলিকদের' সরোজ দত্ত একসময় সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, এই বস্তুতন্ত্রবাদীদের কমিউনিস্ট হওয়ার সাহস আছে কিনা। পরবর্তীতে *পরিচয়* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত 'কমিউনিস্ট ভাবুকদের'ও 'যথার্থ কমিউনিস্ট' হওয়ার 'মুরোদ' আছে কিনা, এ প্রশ্ন নির্দ্বিধায় উত্থাপন করেছিলেন। সরোজ দত্ত যে আগুন চিন্তা-চেতনা-অনুশীলনের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ করেছিলেন নির্দ্বিধায়, সমর সেন দ্বিধাচিত্ততার দরুণ তা পারেন নি। অন্যদিকে পার্টি-রাজনীতির অনুসারিতায় সরোজ দত্ত পার্টি-পরিবৃত্তের বাইরে থাকা পার্টি-রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল, বুদ্ধিচিত্ততায় পার্টি-রাজনীতির প্রতি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির পোষক বুদ্ধিজীবী-লেখকদের প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। অতিবামমার্গী চিন্তাশ্রয়িতায় তিনি যত বেশি আক্রমণ রচনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, সংবেদনশীলতার শৈথিল্যে ততখানি সুস্থিরচিত্ততার, বৈজ্ঞানিক-বিচারমনস্কতার পরিচয় রাখতে পারেন নি।

সমর সেন-সরোজ দত্ত সহপাঠী বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও কেন জানি না তাঁদের মধ্যে সম্পর্কগত নৈকট্য রচিত হয়নি। এক অনপনেয় দূরত্ব তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। চল্লিশ দশকের ঊষালগ্নে সমর সেন-সরোজ দত্ত বিতর্কে দুই বন্ধু একে অপরকে যেভাবে অভিহিত করেছেন, তাতে সম্পর্ক-নৈকট্যের বিপরীত তথ্যই প্রকাশ পায়। সমর সেনকে সরোজ দত্ত 'শ্রীযুত সেন' হিসেবে সম্বোধন করেছেন, আর সমর সেন সরোজ দত্তের নাম-অনুল্লেখে তাঁকে সমালোচক হিসেবে (এবং উত্তরকালে সরোজবাবু হিসেবে) সম্বোধিত করেছেন। এই বিতর্ক নতুন করে পড়েও মনে হয় সমর সেন-কে বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করার কোন অভিপ্রায়-ই সরোজ দত্তের ছিল না। সরোজ দত্তের প্রথম সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন সমর সেন। দ্বিতীয় সমালোচনার জবাব আর দেননি।

দুই

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলন উপলক্ষে বুদ্ধদেব বসু 'বেঙ্গলি লিটারেচার টুডে : পজিশান অব মডার্ন রাইটার্স' শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই প্রবন্ধটির প্রত্যুত্তর হিসেবে সরোজ দত্ত লিখেছিলেন, 'ছিন্ন কর ছদ্মবেশ' শীর্ষক প্রবন্ধটি। ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যার *অগ্রণী* পত্রিকায় প্রবন্ধটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সরোজ দত্ত বুদ্ধদেব বসুর 'পাণ্ডিত্য ও রচনাশক্তি'-র প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেছেন, যদিও

---

* সমর সেন তাঁর 'বাবুবৃত্তান্ত'-এ লিখেছেন, স্কটিশে 'রাজনৈতিক আন্দোলন' মাঝেমধ্যে কিছুটা হলেও তা তেমন 'উল্লেখ করার মতো নয়'। সমর সেনের পিতা অরুণ সেনও এই কলেজেই শিক্ষকতা করতেন। অরুণ সেনের ক্লাশ করার সময়কার এক স্মৃতিচারণায় সমর সেন লিখেছেন : 'কয়েকবার রাস্তায় হরিবোল শুনে সরোজ দত্ত দাঁড়িয়ে উঠে বাবাকে জানালেন, 'স্যার, আর একজন রাঁড় হলো।' ক্লাস থেকে তিনি বহিষ্কৃত হলেন; বাবা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন যে 'রাঁড়'-এর আর একটা অর্থ বিধবা— 'রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট' (ভারতচন্দ্র)। — *বাবু বৃত্তান্ত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ২৯।

** সমর সেন বি.এ. (সাম্মানিক) এবং এম.এ. উভয়ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

বুদ্ধদেবের বক্তব্য বিষয়ে তাঁর বিরোধও তিনি নির্দ্বিধায় উপস্থাপিত করেছেন। বুদ্ধদেবের বক্তব্যের মধ্যে সরোজ দত্ত বুদ্ধদেবের 'প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি'-র সন্ধান পেয়ে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছেন এবং 'আশা' ব্যক্ত করেছেন বুদ্ধদেব এই 'সংশয়' অচিরেই কাটিয়ে উঠবেন; তিনি বুদ্ধদেবের 'প্রখর উজ্জ্বল ভবিষ্যত' সম্পর্কে আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন। এখানে সরোজ দত্ত বুদ্ধদেব বসুকে 'বুদ্ধদেববাবু' হিসেবে সম্বোধন করেছেন এবং তাঁর বক্তব্য ও অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন। অথচ বন্ধু সমর সেনের প্রবন্ধের এবং কবিতা সমালোচনা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির এই নমনীয়তা ও সহনশীলতা স্পষ্টতই অপসৃত। সমর সেনের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে, প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে পঠিত এবং 'নিউ ইন্ডিয়ান লিটারেচার' পত্রিকার দ্বিতীয় সংকলনে (১৯৩৯) প্রকাশিত সমর সেনের 'ইন ডিফেন্স অব দ্য ডেকাডেন্টস' প্রবন্ধটির বক্তব্য জুড়ে সরোজ দত্ত লেখেন 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ যা *অগ্রণী* পত্রিকার এপ্রিল ১৯৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একবছর আগে এই *অগ্রণী*-র পৃষ্ঠায় বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য তথা প্রবন্ধের সমালোচনার ক্ষেত্রে সরোজ দত্ত যে যুক্তিনিষ্ঠ, স্থিতধী, বিবেকবান সমালোচকের পরিচয় রেখেছিলেন, একবছর পরে সেই *অগ্রণী*-র পৃষ্ঠায় সমর সেনের কবিতা-প্রবন্ধের সমালোচনার ক্ষেত্রে তা দুর্নিরীক্ষ্য থেকেছে। কে বা কারা সমর সেনকে 'বিপ্লবী' বলেছেন এবং সমর সেন সেই অভিধা হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে নিজেকে 'বিপ্লবী' প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় অক্লান্ত— এমনই এক পূর্বনির্দিষ্ট উপপত্তি থেকে শুরু করে সরোজ দত্ত সমর সেনের উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন। তাঁর ক্রোধের প্রাবল্য যুক্তির তরলতায় ঘনঘন বিষ উদ্‌গিরণে অক্লান্ত থেকেছে। এ যেন ঘোষিত শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধঘোষণার দুন্দুভিনিনাদ। সরোজ দত্ত লিখেছেন :

> শ্রীযুত সেন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের অধিবাসী অথচ বিপ্লবী। অতএব স্বভাবতই আমরা তাঁহার কাব্যে ভাবাদর্শের বেদনাময় পরিণতির একটি পথরেখা আবিষ্কার করিব। কিন্তু কোথায় সে পরিণতি? ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ক্ষয়িষ্ণু কবি শ্রীযুত সেনের সাম্যবাদী ভাবাদর্শ 'উর্বশীর মতো যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা, পূর্ণ প্রস্ফুটিতা'। কবি ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া কাব্যও ক্ষয়িষ্ণু হইবে, কিন্তু ভাবাদর্শ হইল সমস্ত ক্ষয়, অপচয়ের উর্দ্ধে সুগঠিত, সুসম্পূর্ণ, সুসম্বদ্ধ সাম্যবাদ। কোকেনের প্যাকেটে ঔষধের লেবেল মারিয়া দিবার মধ্যে যেটুকু বাহাদুরী আছে তাহা শ্রীযুত সেনেরই প্রাপ্য।

এখানে সরোজ দত্তের বক্তব্য থেকেই অনুমিত হওয়ার অবকাশ থেকে যায় যে এহেন বক্তব্যসম্পন্ন আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ পূর্ব পরিকল্পনাপ্রসূত। স্বভাবতই ক্রোধ ও চোখাচোখা শব্দের গাঁথুনিতে প্রবন্ধের ইমারত নির্মিতি পেয়েছে। সরোজ দত্তের বক্তব্য অনুযায়ী ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের অধিবাসী হলে আর 'বিপ্লবী' হওয়া সম্ভব নয়, যদিও সমর সেন সেই বিপ্লবীর ভান করেছেন, আর স্বাভাবিকভাবেই সরোজ দত্ত এই 'বিপ্লবী'-র কাব্যে 'ভাবাদর্শের বেদনাময় পরিণতির' পথরেখা 'আবিষ্কার' করার কাজে ব্রতী হয়েছেন। পূর্বপরিকল্পনা বা পূর্বনির্ধারণের তথ্য এখানে সুলভ। 'বিপ্লবী' সমর সেনের 'সাম্যবাদী ভাবাদর্শ' সরোজ দত্তের কাছে উপহসিত হয়েছে। এবং এরপর তিনি সমর সেনের প্রাপ্য হিসেবে যা বরাদ্দ করেছেন, তা হলো 'কোকেনের প্যাকেটে ঔষধের লেবেল' মারার বাহাদুরি! এই আক্রমণাত্মক বক্তব্যের ভেতর ব্যক্তি-বিদ্বেষের লাক্ষণিকতার সন্ধান মেলে যদিও তার কোনো যুক্তিভিত্তিক কারণ অধরা থেকে যায়। সরোজ দত্ত তাঁর এই প্রবন্ধে লিখছেন :

> বর্তমান decadent মধ্যবিত্ত সমাজে বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীরা ভিড়ের মধ্যে Text Book Marxism-এর যে সহজ সিদ্ধির পথ শ্রীযুক্ত সেন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে তাঁর বৈষয়িক ধূর্ততার প্রশংসা না-করিয়া আমরা থাকিতে পারি না।

সরোজ দত্ত এখানেও থামেননি। তিনি সমর সেনকে 'বিপ্লবী' সাজার কুশলীপনার অনুশীলক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন; তাঁর মতে সমর সেনের কবিতা 'Intellectual Clique'-এর জন্য লিখিত এবং তা 'বিপ্লবের নামে 'individual anarchy'-র চরম রূপ বিশেষ। আর এরই প্রেক্ষিতে তিনি পাঠকবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ''ইন্টলেক্টচুয়ালি কুসংসর্গ হইতে সাম্যবাদের সাবধান হইবার দিন আসিয়াছে।''

বলাই বাহুল্য, সমর সেন সরোজ দত্তের এহেন আক্রমণে আঘাত পেয়েছিলেন। *অগ্রণী*-র পরবর্তী সংখ্যাতেই (মে, ১৯৪০) প্রকাশিত হয় সমর সেনের প্রতিবাদী বক্তব্য, একই শিরোনামে ('অতি আধুনিক বাংলা কবিতা')। সমর সেন শুরুতেই লিখেছেন :

> ...আমার কিছু বলার আছে, কারণ সমালোচক বিনাকারণে শূন্যে ঘন ঘন ছোবল মেরেছেন, এবং আমার লেখা In Defence of the Decadents শীর্ষক যে-প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তাঁর ঘোরতর আপত্তি, তার সারাংশ দিতে গিয়ে আমার বক্তব্যের বিকৃতি অনেক জায়গায় করেছেন।

সমর সেনের প্রত্যুত্তরের মধ্যে লাগামহীন ক্রোধের শরীরচর্চা নেই, নেই প্রতি-আক্রমণের উদ্যোগপর্বের কোনোরকম মহড়া। স্থিতধী, সংযত সমর সেন তাঁর কলমে রচনা করেছেন আত্মরক্ষার ব্যূহ। তিনি লিখেছেন :

> সমালোচকের কী কারণে জানি না দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' কবি বলে প্রচার করি, অথচ

আসলে আমি নির্বোধ, কিম্বা প্রবঞ্চক, বিপ্লবী নই; ...তাঁর এই মূল অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ জ্ঞাতসারে কোনো কবিতা কিম্বা অন্য লেখায় আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' বলে জাহির করিনি, উপরন্তু কর্মভীরু, পলাতক, আধা-বাস্তব, আধা-রোমান্টিক ভাবেই আমার নায়ককে বর্ণনা এবং বিদ্রূপ করে এসেছি। ...যদি লোকমুখে *অগ্রণী*-র সমালোচক 'বিপ্লবী' বিশেষণ আমার সম্বন্ধে শুনে থাকেন, তাহলে আমি নিরুপায়। আমার প্রবন্ধটি বাংলা কবিতা এবং সমালোচনার কয়েকটি ধারার বিষয়ে লিখিত, 'আপন সাহিত্য রচনার বৈপ্লবিকতা... ব্যাখ্যা' করার কোনো উদ্দেশ্য তাতে ছিল না, বাংলা কবিতায় আলোচনাকে নিজের কবিতার আচ্ছায় রূপান্তরিত করতে আমি সচেষ্ট হইনি।

সরোজ দত্তের লেখার মধ্যে যে ব্যক্তি-বিদ্বেষের লাক্ষণিকতার সন্ধান মেলে বলে আমরা উল্লেখ করেছি, তা সরোজ দত্তের প্রত্যুত্তরে সমর সেন নিজেই উল্লেখ করেছেন। সমর সেন তাঁর জবাবি বক্তব্যের উপসংহারে লিখেছেন :

> বর্তমানে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং আক্রোশ Marxist সমালোচনার নামে যদি চলে তাহলে বিস্মিত হওয়াটা মানসিক বিলাস, কারণ বাংলাদেশের আজ যে-অবস্থা তাতে অগ্রগামী ব্লক রাতারাতি গুণ্ডা-ব্লকে পরিণত হলেও বাহবা পায়। যে গালিগালাজ, যে উগ্রবামপন্থা আজ সাম্যবাদের নামে সমালোচনা-সাহিত্যে আস্ফালনরত সেটা পূর্বতন বাঙালি সন্ত্রাসবাদের দায়ভাগ।

সমর সেনের এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয় যে তিনি সরোজ দত্তের প্রবন্ধটিকে 'ব্যক্তিগত আক্রমণ' ও 'নিষ্ফল আক্রোশ' হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন যদিও তা মার্কসবাদী সমালোচনার 'নামে' চালিত হয়েছে। অর্থাৎ সমর সেনের বক্তব্যের নির্গলিতার্থে যা প্রকাশ পায়, তা হলো মার্কসবাদী সমালোচনায় ব্যক্তি-আক্রমণের স্থান নেই। দ্বিতীয়ত, সমসময়ে বাঙলাদেশে 'সাম্যবাদের নামে' উগ্রবামপন্থা এবং 'গালিগালাজ' সমালোচনা-সাহিত্যে 'আস্ফালনরত' ছিলো। এবং এই আস্ফালনকে তিনি 'পূর্বতন বাঙালি সন্ত্রাসবাদের দায়ভাগ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

সমর সেনের বক্তব্য *অগ্রণী*-র যে সংখ্যায় (মে, ১৯৪০) প্রকাশিত হয়, সেই একই সংখ্যায় একই সঙ্গে সরোজ দত্তের প্রত্যুত্তরও প্রকাশিত হয়। এই প্রত্যুত্তর, আমাদের মনে হয়, সমর সেনের বক্তব্যের জবাব হিসেবে যথেষ্ট নয়। নিজের পূর্বলিখিত বক্তব্যের সমর্থনেই সরোজ দত্ত এখানে শব্দ ও বাক্যের বিভিন্ন রকম কসরৎ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তাতে করে সমর সেনের বক্তব্যের প্রতি-বক্তব্য হিসেবে সরোজ দত্তের বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্যে মাত্রাযুক্ত হয়নি। কেন তিনি সমর সেনকে 'বিপ্লবী' ভেবেছেন তার সূত্র হিসেবে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্যকে সাক্ষী মেনেছেন, যা গ্রাহ্যযুক্তির ছাড়পত্র পেতে পারে না। সমর সেন সরোজ দত্তের লেখার বিরুদ্ধে পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিগত আক্রমণ-এর অভিযোগ আনায় সরোজ দত্ত সমর সেনকে 'ব্যবহারিক সুরুচি ও মানসিক শুচিতার পরিচয় দেন নাই' বলে প্রতি-অভিযোগ করেছেন। সমালোচনা-সাহিত্যে সাম্যবাদের নামে উগ্রবামপন্থা এবং গালিগালাজের আস্ফালনের যে কথা সমর সেন বলেছেন, সরোজ দত্ত তার মধ্যে সমর সেনের 'ভারতবর্ষের অফিশিয়াল সাম্যবাদের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ'-এর প্রয়াস সন্ধান করেছেন। সরোজ দত্তের যুক্তি-তারল্য এখানে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রতিষ্ঠা পায় তাঁর আবেগশাসিত বিপ্লবীমননের দিকটিও। তিনি সমর সেনকে 'সাম্যবাদে বিশ্বাসী এবং সাম্যবাদী আন্দোলনে সহানুভূতিশীল' হিসেবে অবশেষে স্বীকার করেও তাঁর প্রতি বন্ধুতার নিদর্শন রাখতে পারেননি, বরং নিজের অবস্থানকে আঁকড়ে থাকতে উদ্যোগী হয়েছেন যুক্তির অসংলগ্নতার প্রকট প্রকাশ ঘটার পরও। সমর সেনের বক্তব্যের মধ্যে অফিসিয়াল সাম্যবাদের সমর্থন আদায়ের প্রয়াস আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে তিনি কি নিজের অবস্থানকে উন্মোচিত করেননি?

সমর সেনকে ক্রমাগত আক্রমণ করে গেছেন সরোজ দত্ত তাঁর দু'দুটো প্রবন্ধে। এই সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সমর সেনের যে প্রবন্ধটি থেকে গিয়েছিল তা হলো 'ইন ডিফেন্স অব দ্য ডেকাডেন্স'। এই প্রবন্ধে সমর সেন যা লিখেছিলেন, তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

> Mass-appeal is indeed a tremendous thing. It can at least help to fill up the empty pocket of the unfortunate writers. But how do the masses come in? The vast majority of them is illiterate. The reading section consists entirely of the middle classes. To appeal to them is to pander to the tastes of a demoralised class, to turn poetry into simple wishfulfillment... If the middle-class had any vitality left it would have at least created something significant during and after the Civil Disobedience Movement. But nothing of that kind happened because at this late hour of history the Colonial bourgeoisie has no life at all. With huge and vital section of our population illiterate and dim in the back-ground, we cannot really hope to effect a revolution with our writings. That would be putting the cart before the horse. We can at present only soliloquise, we cannot address the real audience.

সমর সেন কি খুব ভুল কিছু বলেছিলেন? তিনি আরো লিখেছেন :

> We believe that mankind will undergo a far-reaching transformation in a classless society, that only in a changed social order, politically free, and based on emancipation and equality of the peasant and the worker, will it again be possible to establish the vital links between literature and the people which has snapped, but at present we find ourselves unable to translate that belief into good poetry. We cannot do that unless we act. In the meantime we draw a distinction between the poetry of revolutionary struggle and a poetry of revolution as a literary fashion.

বোঝা দুষ্কর এই বক্তব্যে সরোজ দত্তের অতি ক্রোধের বশবর্তী হওয়ার কী কারণ ঘটতে পারে। সমর সেন পার্টির সঙ্গে যুক্ত হননি ঠিকই, কিন্তু পার্টি-রাজনীতির স্পর্শ এড়িয়ে চলেননি। কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের পরিমণ্ডলে তাঁর গতায়াত ছিল। মার্কসীয় সাহিত্য পাঠে তাঁর আগ্রহ ও বিচরণ ছিল যথেষ্ট রকম। তিরিশের দশকের শেষের দিকে তিনি কমিউনিস্ট নেতা অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং সুশীল চট্টোপাধ্যায়দের সঙ্গে একবার মার্চ মাসের প্রখর রৌদ্রে কয়েক ক্রোশ পথ হেঁটে এক কৃষকসভার মিটিং-এ গিয়েছিলেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচারে আসানসোলে গিয়েছিলেন এবং সে সময় সক্রিয় রাজনীতিতে আসার বিষয়টি ভাবনাচিন্তায় এনেছিলেন। যদিও পরে অনেক চিন্তা করে বুঝেছেন যে তাঁর দ্বারা 'সক্রিয় রাজনীতি' হবে না। সক্রিয় রাজনীতি করার চাইতে 'বিপ্লবী' কবিতা লিখলে এবং পার্টিকে অর্থ সাহায্য করলে তাঁর পক্ষে ভালো হবে বলে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন তাঁকে পার্টিতে কর্মী হিসেবে নিলে পার্টির কোনো লাভ হবে না। আসলে স্বশ্রেণী অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকেই তিনি পার্টিমনস্ক থাকতে চেয়েছেন, পার্টিকর্মী হতে চাননি। সরোজ দত্ত কি এসব জানতেন না? তবে কেন তিনি সমর সেনকে এভাবে আক্রমণ করেছিলেন? বন্ধুকে শত্রু বানাবার এই মহড়ার উদ্দেশ্য কী হতে পারে?

তিন

কমিউনিস্ট পার্টির সৈনিকব্রত নিয়ে সরোজ দত্ত পার্টি-রাজনীতির প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। পার্টি অনুসৃত পথের পক্ষেই তিনি তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করেছিলেন। পার্টির বক্তব্যকে তিনি নির্দ্বিধ মান্যতা দিতেন। পার্টির মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে, বিতর্কে তিনি পার্টির পক্ষেই অবস্থান নিতেন। তর্ক করতেন। এমন কি পার্টির স্তালিন-বিরোধী অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি একসময় সুরেশ মৈত্র-র বাড়ির স্তালিনের ছবি নামিয়ে ফেলতে উৎসাহী হয়েছিলেন! পরবর্তীতে অবশ্য সরোজ দত্ত নিজেকে পরিবর্তিত করেছিলেন। পার্টিতে থাকাকালীন তিনি মুজফফর আহমেদ-এর প্রশংসা করতেন, জ্যোতি বসু সম্পর্কে তেমন কোনো মন্তব্য করতেন না। উত্তরকালে তাঁর অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যেরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু সমর সেন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন ঘটেছিল কি? ঘটেছিল এমন সাক্ষ্য দুর্লভ। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছেন সরোজ দত্ত। সমর সেন-ও। পার্টি-পরিবৃত্তের মধ্যে সরোজ দত্ত মহাজীবনের শেষ ঠিকানা অন্বেষণে কোনোদিন ক্লান্তিবোধ করেননি। কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের প্রক্রিয়ায় তিনিও শিবির পাল্টেছেন। সিপিআই থেকে সিপিএম-এ এসেছেন। পরে সিপিআই(এমএল)-এ। যখন কমিউনিস্ট পার্টির যে ধারায় থেকেছেন, প্রশ্নহীন মান্যতা দিয়েছেন পার্টির মত ও পথকে। নকশালবাড়ির লাল আগুন সরোজ দত্তকে প্রকৃত বিপ্লবীর পরিশুদ্ধতা দিয়েছিল। তাঁর সমস্ত ভুল, অতিবামমার্গিতা, হঠকারিতা সত্ত্বেও তাঁর বৈপ্লবিক সত্তার পরিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত থেকেছে।

সমর সেন কোনোদিন কমিউনিস্ট পার্টির পরিবৃত্তে নিজেকে বাঁধতে চাননি। পার্টির বাইরে থেকেছেন চিরকাল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য নিয়েই। কমিউনিস্ট পার্টির অনেক মত ও অনুসৃত পথ নিয়ে একমত হতে পারেননি, প্রশ্ন তুলেছেন, সমালোচনা করেছেন— পার্টি-বিরোধী নয়, পার্টিমনস্কতার আন্তরিকতা নিয়েই। তাঁর গান্ধী-বিরোধিতাকে সমর সেন কখনও গোপন করেননি। সুভাষচন্দ্রের অনুসৃত পথ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সিপিআই-এর ইন্দিরা-প্রীতি নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন, সিপিএম-এর দ্বিচারিতাকে নির্মমভাবে বিদ্ধ করেছেন। এমনকি নকশালপন্থার প্রতি আনুগত্যের প্রশ্রয় দিয়েও তাদের অনুসৃত বহু পথ ও পন্থার নির্মম এবং ক্ষমাহীন সমালোচনা করেছেন। মনীষী মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় অনেকের নবমূল্যায়ন করলেও সরোজ দত্ত তথা নকশালপন্থীরা বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করেননি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

সমর সেনকে সরোজ দত্ত কোনোদিনই বুঝতে পারেননি। বলা যায় বুঝতে চাননি। সমর সেন সম্পর্কে তাঁর মননগত বৈরিতা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। কেন? সমর সেন তো তাঁর শত্রু নন। পরিবর্তনের যে ধারায় হাঁটতে হাঁটতে তিনি নকশালবাড়ির নবালোকিত পথে সিপিআই (এমএল)-এর রাজনীতির অন্যতম পৌরোহিত্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সমর সেনও পার্টি-বহির্ভূত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী

হিসেবে পরিবর্তনের ধারায় হাঁটতে হাঁটতে সেই নকশালপন্থার মধ্যেই জীবনের শেষ ঠিকানা অন্বেষণ করতে চেয়েছিলেন। নকশালপন্থী রাজনীতির প্রতি তাঁর যে-সমর্থন 'Now' পর্যায়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল, 'ফ্রন্টিয়ার' পর্যায়ে তা মহীরুহের আকার নিয়েছিল।

অন্ধত্ব সরোজ দত্তের চিন্তাচর্চাকে বহুবার গ্রাস করেছে। সমর সেন চোখ-কান খোলা রেখে চলেছেন চিরদিন। আপস করেননি সরোজ দত্ত মতাদর্শের প্রশ্নে, আপস করেননি সমর সেনও। ক্যারিয়ার নির্মাণের সমস্ত সম্ভাবনাকে স্বহস্তে নির্মূল করে সমর সেন 'ফ্রন্টিয়ার' নিয়ে রৌদ্রদগ্ধ রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। সরোজ দত্ত দুঃসাহস দেখিয়েছেন অতিবাম হঠকারিতার অনুশীলনে, ভুল লাইনের প্রয়োগে। সমর সেন সরোজ দত্তদের তথা নকশালপন্থীদের হঠকারী লাইনের অনুসৃত পথ ও পন্থাকে নির্মমভাবে সমালোচনার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। সরোজ দত্ত মূর্তিভাঙার নামে মূর্তিপূজার উপাসক হয়ে উঠেছিলেন। পার্টির কথা, পার্টির নির্দেশ তিনি অলঙ্ঘ্য বিবেচনা করেছেন। কোনোরকম প্রশ্নকে মান্যতা দিতে চাননি। প্রশ্ন আর পার্টি-বিরোধিতাকে সমার্থক করে তুলেছিলেন। পার্টির নামে প্রশ্নহীন আনুগত্য চালু করতে চেয়েছিলেন। লিন পিয়াও যেভাবে মাও-কে দেবাসনে বসাতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রতি প্রশ্নহীন মান্যতার মাধ্যমে, অনুরূপভাবে সরোজ দত্ত মাও ও চারু মজুমদারকে দেবাসনে বসাতে চেয়েছিলেন। কোনোরকম প্রশ্নকে মান্যতা দিতে চাননি। চারু মজুমদার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলার মানে সিপিআই(এমএল) -এর বিরোধিতা করা। সিপিআই(এমএল)-এর কোনো মত-পথ নিয়ে প্রশ্ন তোলার অর্থই হল সিএম-এর বিরোধিতা করা অর্থাৎ বিপ্লবের বিরোধিতা করা, প্রতিক্রিয়ার হাত শক্ত করা, শ্রেণীশত্রুর হাত শক্ত করা। সুতরাং প্রশ্ন করা চলবে না, প্রশ্নহীন পূজার প্রবর্তনই তো তিনি চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে সমর সেন বলেছেন :

(ক) 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে বিশ্বাস ছিল না'

(খ) 'ভোটে অবশ্য বিপ্লব সাধিত হয় না! তার জন্য অন্য পন্থা দরকার।'

(গ) 'যে পার্টিতে বিশ্বাস ছিল সেটি খণ্ডবিক্ষিপ্ত, অনেককে মারা হয়েছে নৃশংসভাবে অনেকে কারাগারে, মাও-সে-তুং-এর দীর্ঘযাত্রা শেষ'।

(ঘ) ''লাইন' বেঠিক হলে আন্দোলনে যোগ দিয়েও ব্যর্থতা আসে'।

সমর সেনের এসব বক্তব্য বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর-ই, প্রতি-ক্রিয়ার কোনো দাসানুদাসের নয়। তিনি সরাসরি নকশাল-রাজনীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন, আবার তাদের হঠকারিতার সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন। সরোজ দত্ত এসব বুঝতে চাননি। সমর সেনের 'ফ্রন্টিয়ার'-এর বিরুদ্ধে সরোজ দত্ত চল্লিশ দশকের বিষ নতুন করে নতুন উদ্যমে তিন দশক পরে উগরে দিয়েছেন। সরোজ দত্ত এবারও কি শূন্যে ছোবল মেরেছিলেন? হয়তো!

চার

সমর সেনের কবিতা ও প্রবন্ধ নিয়ে সরোজ দত্তের সমালোচনা *অগ্রণী*-তে প্রকাশিত হওয়ার পর সমর সেন ১৬ মে,১৯৪০ তারিখে বুদ্ধদেব বসুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

> 'অগ্রণী'-তে আমার প্রবন্ধ এবং কবিতা সম্বন্ধে একটি বিরাট বামপন্থী সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে 'নির্বোধ', 'প্রবঞ্চক' ইত্যাদি বামপন্থী বিশেষণ সমালোচক আমার সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছেন। প্রবন্ধটি পড়লে বেশ মজা পাবেন।

এর সাঁইত্রিশ বছর পরে ৩০ নভেম্বর, ১৯৭৭ *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় 'উড়ো খৈ' শীর্ষক একটি লেখায় সমর সেন আবার লিখেছিলেন সরোজ দত্তের সেই সমালোচনা প্রসঙ্গে।* লিখেছিলেন :

> সরোজ দত্তের বক্তব্য বলিষ্ঠ। উপসংহারে তিনি কবি-প্রবন্ধকারকে (অর্থাৎ সমর সেনকে) নির্বোধ, প্রবঞ্চক ইত্যাদি বলেছেন। ...প্রবন্ধকারের (সমর সেনের) জবাবটা বালখিল্যসুলভ নয়, যদিও কোথাও একটা ফাঁকি রয়ে গিয়েছে। সরোজবাবুর প্রত্যুত্তরটা কিন্তু অনেকটা উকিলসুলভ। সে সময়কার মনোভাব বিষয়ে সরোজ দত্ত যা লিখেছেন তা উপভোগ্য... তবু নির্বোধ, প্রবঞ্চক কথাগুলি অস্বস্তিকর ঠেকল...

দেখা যাচ্ছে সরোজ দত্তের সমালোচনাকে সমর সেন সবসময়ই

---

* সাতাত্তরের অগাস্ট ৩ তারিখ থেকে শুরু করে ডিসেম্বর ২৮ তারিখ পর্যন্ত সমর সেন 'উড়ো খৈ' শিরোনামের সাতটি নিবন্ধ লিখেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। সুরেশচন্দ্র মৈত্র সরোজ দত্ত প্রসঙ্গে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'কালপুরুষ' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় শঙ্কর সেন ছদ্মনামে একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গত লিখেছিলেন :

> ...সরোজ দত্তের সেই বহুখ্যাত... প্রবন্ধের ('অতি আধুনিক বাংলা কবিতা') লক্ষ্য যাঁরা তাঁদের মধ্যে আজ বুদ্ধদেব নেই, সমর সেন আছেন। মাঝে মাঝে বুদ্ধিবিলাসী একদা কবি ঐ ভদ্রলোক সাংবাদিক উড়ো খৈ নিবেদন করে চলেছেন কোন গোবিন্দের উদ্দেশ্যে জানি না। তবে তার কুশাসনখানি পেতেছেন কোন এক হর্ষোৎফুল্ল বিপণন কেন্দ্রে। তাই ভরসা হয় পুরোহিত মহাশয়ের সংসর্গ নির্বাচন দেব-নির্বাচনে সাফল্য লাভ করবে। সরোজ দত্তের পুরানো উক্তিটি আজও দেখি বাসি হলো না— 'ইন্টেলেকচুয়ালি কুসংসর্গ হইতে সাম্যবাদের সাবধান হইবার দিন আসিয়াছে।'

আপসপন্থার পরাঙ্মুখ সমর সেন একসময় আনন্দবাজার হাউসের ইংরেজি পত্রিকার সংসর্গ ত্যাগ করেছিলেন নির্দ্বিধায়। অথচ সাতাত্তর-এ এসে তিনি সেই *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় 'উড়ো খৈ' লিখেছেন। এ নিয়ে সুরেশচন্দ্রের প্রশ্ন তোলা সংগত। কিন্তু এর মধ্যে সরোজ দত্তের পুরানো কথার সার্থকতা অন্বেষণ প্রশ্নাতীত নয়। আসলে সমর সেনের উগ্র সিপিআই বিরোধিতাই কি সুরেশচন্দ্রকে ক্ষুব্ধ করেছিল?

'উপভোগ্য' বলে মনে করেছেন, এর মধ্যে মজা খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু যা তাঁকে ঘটনার সাঁইত্রিশ বছর পরেও অস্বস্তিতে ফেলেছিল, তা হলো তাঁর সম্পর্কে সরোজ দত্তের নির্বোধ, প্রবঞ্চক জাতীয় শব্দপ্রয়োগ। সমর সেন এটা ভুলতে পারেননি। তাই সরোজ দত্তের শেষ দেখার স্মৃতিও তাঁর কাছ ধূসর হয়ে গেছে। তিনি মনে করতে পারেন না শেষ-দেখা বিশ শতকের 'তিরিশের দশকের শেষে, দিল্লি যাবার আগে' হয়েছিল কিনা। তাঁর জনৈক বন্ধু তাঁকে যখন জানান যে ১৯৬৬-র জানুয়ারিতে একটা বৌভাতের নিমন্ত্রণের আসরে সরোজ দত্তের সঙ্গে সমর সেনের অনেক 'গল্পগুজব' হয়েছিল, পাশাপাশি খেতেও বসেছিলেন— সমর সেন তা মনে করতে পারেন নি। মনে করতে সত্যিই পারেননি, না মনে করতে চাননি? সমর সেনের 'ফ্রন্টিয়ার'-কেও সরোজ দত্ত 'শশাঙ্ক' ছদ্মনামে চোখা চোখা শব্দের আয়ুধে গেঁথে ধরাশায়ী করতে চেয়েছিলেন। 'ফ্রন্টিয়ার'কে আক্রমণের ফাঁকে স্বয়ং সম্পাদক সমর সেনকেও খোঁচা দিয়েছেন সরোজ দত্ত। যৌবনের অকারণ বৈরিতাকে নতুন করে জাগাতে চেয়েছেন। *দেশব্রতী*-র ফেব্রুয়ারি ১০,১৯৭০ তারিখের সংখ্যায় সরোজ দত্ত লিখছেন :

> কলকাতার ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ফ্রন্টিয়ার' কাগজ ভীষণ মাওপন্থী। রঙবেরঙের 'মাওপন্থী'র ভিড় সেখানে। তাদের একমাত্র কাজ মনে হয়, কিভাবে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে পরিচালিত সিপিআই(এমএল) মাও সেতুঙের তত্ত্ব ও উপদেশ বিস্মৃত হয়ে বিপথে চলেছে তা বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। ...আর মাঝে মাঝে এদের এইসব তাত্ত্বিক উদগারের বিরুদ্ধে কঁচাকঁচ কাঁচি চালানো একটু আধটু মৃদুমন্দ প্রতিবাদ পত্রাকারে পত্রিকাস্থ করে সম্পাদকমশাই তাঁর 'বস্তুনিষ্ঠা' ও 'নিরপেক্ষতার' পরিচয় দিয়ে সকলকে ধন্য করে থাকেন।

সরোজ দত্তের মতে *ফ্রন্টিয়ার* মাও-এর নামাবলী গায়ে জড়িয়ে চারু মজুমদারের 'বাপান্ত করা'র পেশায় যুক্ত হয়েছে এবং 'চীনবিরোধী যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে'! দৃষ্টিবিভ্রম আর কাকে বলে! সমর সেনের *ফ্রন্টিয়ার*-কে সরোজ দত্ত 'ধড়িবাজ' বলে আখ্যা দিয়ে লিখেছিলেন যে *দেশব্রতী*-র বিরোধিতার মাধ্যমে আসলে *ফ্রন্টিয়ার* জ্যোতি বসু ও যুক্তফ্রন্ট সরকার রক্ষার কাজে ব্রতী হয়েছে। *ফ্রন্টিয়ার*-এর অপরাধ, *ফ্রন্টিয়ার* নকশালপন্থার নামে খতমের রাজনীতিকে সমর্থন করতে পারেনি (দ্র. *দেশব্রতী*, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৯)। ১৯৬৯-এর ১৮ অক্টোবরের বিশেষ সংখ্যায় *ফ্রন্টিয়ার*-এ 'জেনারেল লাইন অব কলোনিয়াল রেভল্যুশান' শীর্ষক রফিকুল ইসলাম-এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই লেখার প্রতিক্রিয়ায় *দেশব্রতী*-র ২০ নভেম্বর, ১৯৬৯ সংখ্যায় সরোজ দত্ত *ফ্রন্টিয়ার*-কে আবারও একহাত নিয়েছেন। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে রফিকুল ইসলাম আসলে ছদ্মনাম, এই ছদ্মনামের আড়ালে 'দলত্যাগী দালাল' সিপিআই(এমএল)-এর রাজনীতিকে 'তুলোধোনা' করেছে। এই 'ছদ্মনাম' নেওয়াকে তিনি কাপুরুষোচিত কাজ বলে চিহ্নিত করেছেন, অথচ বিস্মৃত হয়েছেন যে *দেশব্রতী*-র পাতায় তিনি নিজেই 'শশাঙ্ক' ছদ্মনাম নিয়ে নিয়মিত লিখে যাচ্ছিলেন।

এই অতি-উগ্রতা সরোজ দত্তকে সুস্থতাবোধ-রহিত করেছিল। শত্রু-মিত্র নির্ণয়ে তিনি ভুলের নামাবলী সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। *ফ্রন্টিয়ার*-এর মতো পত্রিকাকে তিনি শত্রু হিসেবে শাসকশ্রেণীর দালাল হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন— আর তার সম্পাদক সমর সেন? তাঁর পত্রিকার পাতায় তো এইসব 'নকশাল বিরোধিতা' হয়ে থাকে, স্বভাবতই সমর সেন-ই তো এর মূল পুরোহিত। ফলে সব কুবিশেষণই শেষ পর্যন্ত প্রযুক্ত হয় সমর সেনের বিরুদ্ধেই। চল্লিশের দশকের আগে থেকেই আদ্যন্ত বিপ্লবী-থেকে-যাওয়া সরোজ দত্ত বিপ্লবীর ভান-করা সমর সেনকে কীভাবে ক্ষমা করবেন? স্বভাবতই সমর সেন সরোজ দত্তের আক্রমণের শিকার হয়েছেন ক্রমাগত। কিন্তু সমর সেন প্রতি-আক্রমণে সরোজ দত্তকে বিদ্ধ করতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাননি কখনও। সরোজ দত্ত ফ্যাসিস্ট শাসনের রক্তচক্ষুর শিকার হন। ১৯৭১-এর অগাস্ট রাতে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পুলিশ কাপুরুষের মতো তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছিল। সমর সেন সরোজ দত্তের 'নিখোঁজ' হওয়ার পুলিশের গল্পকথাকে মনে রেখেই লিখেছেন :

> কলকাতা ৭১। অগাষ্টের একটি করাল রাত্রে সরোজ দত্ত নিখোঁজ হন। শেষের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের মুখোমুখি কিভাবে তিনি হন শুধু ত্রিকালজ্ঞ পুলিশ জানে।

'সরোজ দত্ত মার্ডারড' শিরোনামে 'আ সিটিজেন' একটি চিঠি পাঠান *ফ্রন্টিয়ার*-এ। চিঠিটি ১৬ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে *ফ্রন্টিয়ার*-এ প্রকাশিত হয়। পুরো চিঠিটি উদ্ধৃত করছি :

> A leaflet condemning the news of the death of Saroj Dutta, Secretary, P.C, of the CPI(ML), was published by an area committee of the party. It is stated there that he was arrested and shot dead by the police on the night of August 4, 1971.
>
> The Administration and the police have not confirmed either his arrest or his death. The newspapers are maintaining a mysterious silence.

সমর সেন সরোজ দত্ত-খুন বিষয়ক পুরো চিঠিটাই প্রকাশ করেছিলেন, *ফ্রন্টিয়ার*-এ। কোনরকম মন্তব্য ছাড়াই।

১৬ জুন, ১৯৭৮ তারিখে সমর সেন *নকশালবাড়ি অ্যান্ড আফটার— আ ফ্রন্টিয়ার অ্যানথোলজি*-র ভূমিকা লিখতে গিয়ে যা লিখেছিলেন, নকশাল-আন্দোলন সম্পর্কে তা তাঁর মনোভঙ্গির প্রকাশক। তিনি লিখেছেন :

> Though not a participant, Frontier became associated with the movement... Admittedly, the Naxalites raised more problems than they solved. But the very problems they raised and tried to solve in a hurry had never been raised with such force of sincerity before or after Telengana. This is their achievement... The Naxalite movement has been defeated, but not routed. A process of thinking is on.

এই হলেন সমর সেন। আগুনের মধ্যে পা-ডুবিয়ে না-দাঁড়ালেও আগুনের সংস্পর্শ কখনো এড়িয়ে চলেননি। শারীরিকভাবে রাজনীতির সঙ্গে কখনো যুক্ত হননি, কিন্তু চিন্তা-চেতনে-মননে রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সত্যসন্ধিৎসায় অক্লান্ত থেকেছেন, যার জন্য ঠিককে ঠিক এবং ভুলকে ভুল বলে চিহ্নিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্থতা দেখাননি। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *পিপলস ওয়ার*-এর গ্রাহক হয়েছেন, পড়েছেন, তার জন্য প্রায় নিয়মিত চাঁদা দিয়েছেন। কমিউনিস্ট রাজনীতির খবরাখবর রেখেছেন, যেটা যথার্থ মনে করেছেন সমর্থন করেছেন। যা অযথার্থ মনে হয়েছে সমালোচনা করেছেন। চিরকাল। এই বহমানতা নকশাল-রাজনীতির উত্থান, বিকাশ এবং আপাত-ব্যর্থতার অন্তিম পর্বেও কার্যকর থেকেছে। সরোজ দত্ত সমর সেনকে চিনতে চাননি, বুঝতে চাননি। বন্ধুকে বৈরী ভাবতেই অভ্যস্থ থেকেছেন। নিজে যার বিরোধিতা করেছেন, অন্যকেও তার বিরোধিতায় প্ররোচিত করেছেন। শঙ্কর ঘোষ *ফ্রন্টিয়ার*-এ লিখতেন। সরোজ দত্ত তাঁকে *ফ্রন্টিয়ার*-এ লিখতে নিষেধ করেছেন! শ্রেণীশত্রুর মুন্ডু নিয়ে গেন্ডুয়া খেলার কথা লিখেছিলেন সরোজ দত্ত। সমর সেন নিজে তার সমালোচনা করেন *ফ্রন্টিয়ার*-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে। শঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন সমর সেনের কাছে 'ভয় দেখিয়ে চিঠিও এসেছিল।' সমর সেন ভয় পাননি। সমর সেনের *ফ্রন্টিয়ার*-কে সরোজ দত্ত সিপিএম-এর ভাবমূর্তি রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত বলেও আখ্যা দিতে পিছপা হয়নি। স্বভাবতই সরোজ দত্তের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে।

সমর সেন প্রয়াত হন ২৩ অগাস্ট, ১৯৭৮। সরোজ দত্তের নিহত হওয়ার যোলো বছর পর একই মাসের ভিন্ন তারিখে। সমর সেনের মৃত্যুর পর সিপিআই(এমএল) নেতা বিনোদ মিশ্র যা বলেছিলেন, তা উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি বলেছিলেন :

> He (Samar Sen) symbolised the glory of the old generation of revolutionary Marxist intellectuals of Bengal as well as the aspirations of young Marxist-Leninists for regeneration of revolutionary left movement in India.

সিপিআই (এমএল)-পার্টি ইউনিটির তরফে বলা হয়েছিল :

> The revolutionary upsurge in Naxalbari made a deep inpression on him and he remained a friend of the Communist Revolutionaries ever since.

নকশালপন্থীদের অনেকেই সমর সেনকে উত্তরকালে বন্ধু হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন। সরোজ দত্ত বেঁচে থাকলে কী করতেন?

সরোজ দত্ত স্মরণে

৩১ পৃষ্ঠার পর

হয়ে থকে, তার চাপে পড়ে বিনয় ঘোষ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বরুণ দে প্রমুখ তাঁদের পূর্ববর্তী অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। রেনেসাঁ বিষয়ে সরোজ দত্ত-র বিতর্ক পরিচালনার পদ্ধতি সর্বদা সঠিক ছিল এমন বলা যায় না। তথ্যনিষ্ঠাও অনেক ক্ষেত্রে (যেমন বিদ্যাসাগর বা প্রফুল্লচন্দ্র বা সুভাষ বোস-এর ক্ষেত্রে) বর্জিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কখনও কখনও আক্রমণের ছুরি প্রতিপক্ষের দিকে অযৌক্তিক প্রক্রিয়ায় ধাবিত হয়েছে, কখনও কখনও ব্যক্তিগত আক্রমণের ভাষা হয়তো শিষ্টতার সীমাও লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু কপটতা, দ্বিচারিতার প্রশ্নে সরোজ দত্ত-র অবস্থান মূলত সঠিক ছিল— এটা মানতে হবে। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী সেই যুগের ভারতীয় সমাজকে বিশ্লেষণের জন্য, ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা নিরূপণের জন্য প্রশ্ন তুলেছিল। কে বা কারা কৃষক আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, আর কারা-ই বা ছিলেন বিপক্ষে। ইতিহাস বিচারের সমাজ-বাস্তবতার বিশ্লেষণমূলক অনুধাবনের যে সংকেত সরোজ দত্ত তুলে ধরেছিলেন, নকশালবাড়ি আন্দোলনের অর্ধশতাব্দীর অতিক্রমের দ্বারপ্রান্তে এসে আজও তা সমান প্রাসঙ্গিকতায় ভাস্বর। আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে সরোজ দত্ত তাঁর তীক্ষ্ম লেখনী নিয়ে বর্তমান সমাজের ভণ্ডামি বেপর্দা করার জন্য আজ আর উপস্থিত নেই। তাই আজ মনে পড়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই আর্তি : 'বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে ঘাতকের মিথ্যা আকাশ/ কে গাইবে জয়গান?'

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর ৯৮৩০৯২২১৮৪ বা ৯৩৩১০১২৫৩৭

স্মরণ

নবারুণ স্মরণে

মীনাক্ষী সেন

নবারুণ ভট্টাচার্য চলে গেলেন।

কবি বলেছেন বটে 'কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফোটে'— কিন্তু জীবনের নিরন্তর প্রবাহমানতা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি— যে কুসুমটি ঝরে, সেটি আর ফোটে না।

বাংলা সাহিত্যজগতে নবারুণের জায়গাটি নবারুণেরই। কেউ ওটি ভরাট করতে পারবে না।

মহাশ্বেতাদি, সত্যেনের মৃত্যুর পর, সেই সময়ে বাংলা সাহিত্য জগতের আরও কয়েকটি অকালমৃত্যুর কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন— ক্যান্সার এমন ঘাতক হয়ে বাংলা লেখালেখির জগতে হানা দেবে, তা কে জানত?

সেই ঘাতক কর্কট রোগ এবার মহাশ্বেতাদির নিজের পরিবারটির ও বাংলা লেখালেখির জগতে আবার হানা দিয়ে অপূরণীয় ক্ষতি করে গেল।

নবারুণ জন্মেছিল বহরমপুরে ১৯৪৮ সালের ২৫ শে জুন। দীর্ঘদিন সোভিয়েত দেশে চাকরি করেছে, কলকাতায় বসবাসও করছে দীর্ঘদিন। তারপরও ব্যক্তিগতভাবে নবারুণের সঙ্গে আমার কখনো আলাপ পরিচয় হয়নি। আগে সত্যেনের কাছে, পরে স্বয়ং মহাশ্বেতাদির কাছে তার ছেলের অনেক কথা শুনেছি। এই সেদিনও, ৮ জুলাই কলকাতায় মহাশ্বেতাদির বাড়িতে গিয়ে নবারুণের কথা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখক বাংলা সাহিত্যে, তোরা কিভাবে বুঝিস জানি না। তারপর নবারুণের লেখা নিয়েই কিছু কথা বলে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। এভাবেই শুনতে শুনতে ব্যক্তিগতভাবে নবারুণ আমার মনের ভেতরে পরিচিত মানুষই ছিলেন।

মনে আছে নন্দীগ্রামের ভূমি আন্দোলনের সময় নিহত এক তরুণী বধূকে নিয়ে নবারুণের একটি কবিতা সম্ভবত *দৈনিক স্টেটসম্যান* কাগজে পড়ে এতো আলোড়িত হয়েছিলাম যে সঙ্গে সঙ্গে মহাশ্বেতাদিকে ফোন করে সে কথা বললাম। মহশ্বেতাদি বললেন, "নবারুণকে সরাসরি জানা তোর অনুভূতির কথা।" বলে ফোন নম্বরটা দিলেন। বোধহয় সেইদিনই প্রথম ফোনে কথা হলো। আমার কথা শুনে নবারুণের অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলল, গুরু, তোমাদের 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'-র নবারুণ এখনও মরেনি, পুরোপুরি জিন্দা, বুঝলে? সম্ভবত, সেইদিনই প্রথম নবারুণের সঙ্গে কথাবার্তা হলো ফোনে ফোনে।

আর যদি সত্যি কথা বলি, তবে কবি নবারুণ, গদ্যকার নবারুণের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় ও কাছের। যদিও নবারুণের কাব্যগ্রন্থ 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' (প্রমা, ১৯৮২) ছাড়া অন্য কোনো কবিতার বই আমার কাছে নেই। 'পুলিশ করে মানুষ শিকার', গ্রন্থ প্রকাশনী ১৯৮৭, বইটি আমার কাছে নেই। ওটি এখন পাওয়া যায় কিনা তা-ও জানিনা। আগরতলায় বসে এ খবরও রাখা হয়না যে আরও কোন কবিতার বই নবারুণের প্রকাশিত হয়েছে কিনা, হলে কয়টি, কোথায় পাওয়া যায়। তবে পত্রপত্রিকায় যেখানেই ওর কবিতা পাই, সবই সাগ্রহে পড়ে নিই।

তবে নবারুণের কবিতার প্রতি আমার ব্যক্তিগত মুগ্ধতা যতই থাক— নবারুণের সমধিক খ্যাতি তার গদ্যসাহিত্য, বিশেষত উপন্যাসের জন্যই। নবারুণের লেখা *হারবার্ট*-এর মতো ব্যতিক্রমী উপন্যাস সাহিত্য আকাডেমি পেয়েছে। *ফ্যাতাড়ু* আর *কাঙাল মালসাট* লিখে নবারুণ বিশিষ্ট অন্যধারার লেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্য জগতে তার নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে।

মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য একটি কাব্য হয়েছে কিনা এ নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা-বিশ্লেষণ-বিতর্ক যখন চলছে ততদিনে শিক্ষিত বাঙালি 'রাবণ শ্বশুর সম মেঘনাদ স্বামী' বা 'মজাইলে স্বর্ণ লঙ্কা মজিলা আপনি'— এইসব লাইন প্রবাদ-প্রবচন হিসেবে বলতে শুরু করেছে। তা তুলনা করাটা একেবারেই বাতুলতা, তুলনা না করেই বলছি আধুনিক গদ্যকার বা অন্যধারার গদ্যকার বা তরুণদের মুখে মুখে 'চৌবাচ্চার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগর চললো' কিংবা 'ফ্যাৎ ফ্যাৎ, সাঁই, সাঁই' কথাগুলো ফেরে।

নবারুণের গল্প গ্রন্থ *হালাল ঝান্ডা* (প্রমা ১৯৮৭) অবশ্য আমি পড়িনি, তবে নানা সংকলনে প্রকাশিত তার কবিতা অবশ্যই পড়েছি, গল্পও।

এই ধরনের একজন ব্যতিক্রমী ধারার গদ্য লেখক, যার সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস *হারবার্ট*-এর মলাটের ভেতরে লেখা হয়েছিল 'হারবার্ট' এক মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণ যার চোখে আজকের এই বিশ্বসংসারের ফ্রেম সামান্য বেঁকে আছে। ফলে এক করুণ বাস্তবতা আর হাস্যকর কৌতুকময়তা এক জটিল প্রতিসরণে ঠিকরে যায় বারবার। এ এমন এক জীবনের কাহিনী যা সমস্ত অর্থেই আধুনিক। সময়ের দিক দিয়ে, নিঃসঙ্গতার ব্যাধির দিক দিয়ে, বিশ্লেষণের দিক দিয়েও। যে জীবনে কেউ কাউকে ঠিকমতো বোঝে না। মৃতের সঙ্গে কথোপকথনের তীব্র ভণ্ডামির মধ্যেও যে জীবনে মিশে থাকে অস্পষ্টে না-বোঝার অভিমান।

বাংলা উপন্যাসের ন্যাকামি আর কাঁদুনে-কাঁদানে কাদামাটির মধ্যে এই উপন্যাসে এক দীপ্ত, বুদ্ধিমান মনের সন্ধান নিয়ে

এসেছেন নবারুণ ভট্টাচার্য।— এই বর্ণনার ভেতরে নবারুণের যে নিজস্ব ধারার লেখন শৈলীর উল্লেখ রয়েছে, তেমন একজন লেখকের লেখা যে বাংলায় তার নিজস্ব জায়গা তৈরি করে নিয়েছে— তার লেখা, অন্যধারার চলচ্চিত্র পরিচালক বা নাট্য পরিচালকদের দ্বারা বটেই, তবু মঞ্চস্থ ও চলচিত্রায়িত হয়েছে, তাতে বোঝা যায় সস্তা জনপ্রিয়তার কায়দাকানুনের বাইরে দাঁড়িয়ে লিখেও নবারুণের লেখা এমন এক আকর্ষণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যে আকর্ষণ তার গদ্যের অন্তর্নিহিত শক্তিকেই প্রতিফলিত করে।

নবারুণের মতো লেখকরা ঠিক লেখক হয়ে থাকতে পারেন না, তাদের মধ্যে এক সক্রিয়বাদী সংগঠকও বাস করে। এক সময় কৃষক আন্দোলন বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা 'পেসান্ট পারস্পেকটিভ'-এর সম্পাদক ছিলেন। পরীক্ষামূলক ও গণমুখী নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'নবান্ন' নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর নির্দেশিত 'দেবী গর্জন' বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

জীবনের শেষভাগে প্রকাশ করেছিলেন *ভাষা বন্ধন* নামক সাহিত্য পত্রিকা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার অন্যধারার লেখা ও বিশ্বসাহিত্যের বিশিষ্ট লেখাগুলো অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলো *ভাষা বন্ধন*। সেইসঙ্গে হাজির করছিল বাংলা সাহিত্যের অতীত ও বর্তমানকে। সত্যেন তার *স্পন্দনে* এই কাজটাই করার চেষ্টা করে গেছে সত্যেনের নিজের মতো করে— তাই 'ভাষাবন্ধন' প্রকাশিত হওয়া মাত্র পত্রিকাটির দিকে আকৃষ্ট হই। ত্রিপুরায় বেশ কিছু গ্রাহকও করেছিলাম। তারপর নানা কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কেউ কেউ সরাসরি গ্রাহক হয়ে এখনও পত্রিকাটি সংগ্রহ করেন।

ব্যতিক্রমী পরিবারের সন্তান নবারুণ। মা মহাশ্বেতাদেবী বাংলা সাহিত্য জগতে, বাবা বিজন ভট্টাচার্য নাট্যজগতে দুই দিকপাল।

বিশ্বকর্মার পুত্রকন্যারা সাধারণত বিশ্বকর্মা তো নয়ই, প্রবাদ বলে, অতি ক্ষুদ্র একটা কিছু হয়। নবারুণ এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। মহাশ্বেতা দেবীর ছেলে হয়েও নবারুণের লেখায় মহাশ্বেতা দেবীর লেখনধারার কোনো প্রভাব নেই। নাট্য নির্দেশক হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন, তা অবশ্য আমার জানার সৌভাগ্য হয়নি। তবে একদিক দিয়ে নবারুণ তার পারিবারিক ঐতিহ্যের যথার্থ উত্তরসূরী, সেটি হলো একটি প্রতিবাদী, সদাসক্রিয় মনোভঙ্গি, উচ্চকিত কণ্ঠস্বর।

এসব কণ্ঠস্বর বাংলা সাহিত্য জগতে বিরল হয়ে এসেছে। বিদ্রোহী কণ্ঠেও কোনো না কোনোভাবে বেজে উঠছে প্রতিষ্ঠানের জয়গান। দ্বান্দ্বিকতা প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যেই থাকে, কিন্তু নবারুণ আমৃত্যু তার এই কণ্ঠস্বরটিকে ধরে রেখেছিলেন— এটা এ সময়ে খুব বড় কথা।

নবারুণের মৃত্যুর পর জানতে পারলাম তিনি ২০০৯ থেকে 'লিবারেশন' প্রভাবিত 'গণসাংস্কৃতিক পরিষদ'-এর সভাপতি ছিলেন। ২০০৯ থেকে ২০১৩ অবধি ওদেরই হিন্দিভাষী সংগঠন 'গণ সাংস্কৃতিক মঞ্চ'-এর সভাপতিও ছিলেন। তাতে বুঝলাম পুলকেশ মণ্ডল ও জয়া মিত্র সম্পাদিত *সত্তর দশক*-এর রাজনৈতিক সক্রিয়তার বিবরণে যে নবারুণ লিখেছিল সে খুব সরাসরি সক্রিয়তায় যুক্ত ছিল না। সে কখনও প্রাক্তন বিপ্লবী হয়নি। এখনও সক্রিয়ই ছিল।

বিবেকানন্দের নারী ভাবনা

২৯ পৃষ্ঠার পর

শ্রেষ্ঠ হলো—

> জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

তিনি আশ্রমে মেয়েদের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> পুরনো শিল্পকলাকে পুরুজ্জীবিত কর! আশ্রমের মেয়েদের ক্ষীর দিয়ে ফল গড়তে শেখাও। শিল্পসম্মত রান্না, সেলাইয়ের পাঠ দাও। তারা ছবি আঁকা, ছবি তোলা, কাগজ কেটে নানা নক্‌শা তৈরি করা, সোনারূপোর কারুকাজ, সূচী শিল্প শিখুক। লক্ষ্য রাখ প্রত্যেকটি মেয়ে যেন এমন কিছু জানে যাতে দরকার হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

তাঁর এই বাস্তববোধ লক্ষ্যণীয়, কিন্তু মেয়েরা সাধারণ-ভাবে পুরুষের মতো কাজেকর্মে বহির্জগতে যোগ দিক, এই ইচ্ছা তাঁর দেখা যায়নি। বিশেষ একটি ক্ষেত্র ছাড়া— তা হলো মিস্ নোবেলকে কাজে ডেকে নেওয়া।

তাঁর এই ভাবনা তাঁর যুগের পরিচায়ক। সে যুগ মেয়েদের ঘর ও বাহির নিয়ে দোদুল্যমান, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর 'হিন্দু হিন্দু' বাতিক— যার ফলে তাঁকে সতীদাহও সমর্থন করতে হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে তিনি ভারতীয় নারীর অগ্রগমনে কোন সহায়ক ভূমিকা রাখেননি।

তথ্য সংগ্রহ

১. *বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ*, বইপত্র, কলকাতা, ১৯৮০
২. *অন্য কোন সাধনার ফল*, আশীষ লাহিড়ী
৩. *স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় শতবর্ষে স্মরণে-মননে*, অহল্যা প্রকাশন
৪. *ফিরে দেখা*-১, প্রসন্নময়ী দেবী, আমোদিনী দাশগুপ্ত, সুবর্ণরেখা
৫. *প্রফুল্লময়ী দেবী*, সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত স্মৃতিকথা, বৈতানিক প্রকাশনী